জী আনোয়ার হোসেন

াসুদ
না

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৭

এক

শীতের চাবুক হাতে নিয়ে হু-হু হাওয়া ধেয়ে আসছে নাঙ্গা পর্বত থেকে। পঁচিশে ডিসেম্বর। নিস্তব্ধ রাত্রির ঠাণ্ডা উজ্জ্বল তারাগুলোর নিচে চারদিকে বিছিয়ে আছে কেবল তুষার আর তুষার। যতদূর দেখা যায় জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

ঠক-ঠক করে কাঁপছে রানা। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে—চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না। হিম-শীতল বাতাসটা যেন হাড়ের মধ্যে এসে লাগছে। আজকের টেম্পারেচার পনেরো ডিগ্রী বিলো জিরো, রানা জানে। এতক্ষণ একটানা দৌড়ের পর হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে সে। কিন্তু তার মধ্যেও লক্ষ্য করল একটা ঘুম-ঘুম আলস্য আসছে শরীরে। সচকিত হয়ে মাথা ঝাড়া দিল রানা। তারপর উঠে বসল গর্তের ভেতর। খুব ধীরে ধীরে মাথাটা উঁচু করল গর্ত থেকে—না, কেউ নেই। ওকে গর্তে পড়ে যেতে দেখে কি ওরা তাড়া করা ছেড়ে দিল? নাকি তাড়া করেইনি?

ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। পালাতে হবে। ধরা পড়বার আগেই পালাতে হবে এখান থেকে। ধরা পড়লে রক্ষে নেই।

আবার একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে চারিটা পাশ। কিছুই নড়ছে না কোথাও। রাস্তাটা জনশূন্য। রাস্তার ওপর জমাট তুষারে ট্রাকের চাকার দাগ। শ্রীনগর এখনও বাইশ মাইল। হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। নিজের ওপরই ভয়ানক রাগ হলো ওর।

বেশ আসছিল উরি থেকে ট্রাকের পেছনে লুকিয়ে। হঠাৎ একটা পুলিস ব্লকে গাড়ি থামিয়ে দু'জন সেন্ট্রি গাড়ি সার্চ করতে চাইল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে অসতর্ক সেন্ট্রি দুটোর নাক বরাবর দুটো প্রচণ্ড ঘুসি লাগিয়ে দিয়ে আধ মাইল দৌড়ে চলে এসেছে সে। মোড়ের কাছে পেছন ফিরে দেখেছে রানা, মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সেপাই দু'জন। অনেকখানি সোজা দৌড়ে এসে রাস্তার বাম পাশে কয়েকটা গাছ দেখে তার আড়ালে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে মনে করে যেই একটু বাঁয়ে কেটেছে অমনি সড়াৎ করে পা পিছলে এই গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে সে। কিন্তু সেপাইগুলো থেমে গেল কেন? এই রাস্তায় ওদের হাত থেকে পালাবার কোন উপায় নেই মনে করে? আর রাস্তা ছেড়ে ডাইনে-বাঁয়ে কোনদিকে গেলে তুষারের ওপর পায়ের চিহ্ন ধরে অনায়াসেই খুঁজে বের করা যাবে ওকে, সেজন্যে? যাই হোক, এখন কি করবে সে?

যা হবার হয়ে গেছে। এ নিয়ে চিন্তা করে আর সময় নষ্ট করল না মাসুদ রানা। প্লেনে শ্রীনগর যাওয়া আরও বিপজ্জনক হত। আসন্ন ইন্টারন্যাশনাল সাইন্টিফিক কনফারেন্সের জন্যে জাল পাসপোর্ট নিয়ে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি ডিঙানো ওর পক্ষে

অসম্ভব ছিল। রেলেও একই অবস্থা। কাজেই গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে মাল বোঝাই কোনও ট্রাকের পেছনে উঠে শ্রীনগর পৌঁছানোই এখন একমাত্র রাস্তা। কিন্তু পথের মধ্যে এই বিপদের কথা কেউ ভাবেনি। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে থেকে কৌশলে উদ্ধার পেতে হবে।

অল্পক্ষণেই দম ফিরে পেল সে। ভেবে দেখল, জনা কয়েকের বেশি লোক নিশ্চয়ই থাকবে না এই পোস্টে। খুব সম্ভব এরা চোরাই মাল ধরার জন্যে সার্চ করছিল ট্রাকটা, ভাবতেও পারেনি পেছনে কোন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই আসবে। অন্তত যে দু'জনের নাক থেকে পোয়াটেক রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছে ও, তারা তো ব্যক্তিগত উৎসাহেই আসবে। এখানে বসে থাকার আর কোনও মানে হয় না। রাস্তা ছেড়ে মাঠ-ঘাট আর বরফ জমা খাল-বিলের ওপর দিয়ে হেঁটে মাইল কয়েক পুবে সরে যাবে সে, তারপর চেষ্টা করে দেখবে আবার রাস্তায় উঠে চুরি করে কোনও ট্রাকে ওঠা যায় কিনা।

উঠে দাঁড়িয়ে জামা কাপড় থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলল রানা। পরমুহূর্তেই বসে পড়ল আবার। ডান হাতটা দ্রুত চলে গেল কোটের নিচে শোলডার হোলস্টারের কাছে। আসছে ওরা।

এখন ও বুঝতে পারল কেন ওরা পিছু নিতে এত দেরি করছিল। ইচ্ছে করলে আরও দেরি করতে পারত ওরা। কিছুই এসে যেত না। ও ভেবেছিল কোনও শব্দ বা নড়াচড়া হলেই ধরা পড়ার ভয় আছে—ভুলেই গিয়েছিল গন্ধ বলে একটা জিনিস আছে। কুকুরের কথা ভাবতেও পারেনি সে। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে দেখল এখন, মাটির কাছে নাক নিয়ে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে আসছে চারটে ভয়াল কুকুর। এক নজরেই চিনতে পারল রানা—ব্লাড হাউণ্ড। পেছনে শেকল হাতে গল্প করতে করতে আসছে চারজন সেন্ট্রি।

তিন লাফে গর্ত থেকে বেরিয়ে একটা প্রকাণ্ড চিনার গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল রানা। হাতে ওয়ালথার পি. পি. কে। পনেরো গজ দূর থেকে দশবারে দশবারই সে একটা কমলালেবু ফুটো করতে পারে এই যন্ত্রটা দিয়ে। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। থরথর করে কাঁপছে ওর হাত। অবশ হয়ে যাওয়া তর্জনী দিয়ে ট্রিগার টিপতে পারবে কিনা সে-সম্পর্কেও ওর সন্দেহ আছে।

সেফটি ক্যাচ নামিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরল সে পিস্তলটা। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। অস্পষ্ট তারার আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পেল রানা ব্যারেলের মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে বরফ জমে। তিরিশ গজের মধ্যে এসে গেছে সেপাইগুলো শেকল বাঁধা কুকুরের টানে। আর সময় নেই। বাম হাতে পকেট থেকে একটা বলপয়েন্ট পেন বের করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ব্যারেলের মুখ থেকে জমাট-বরফ বের করতে আরম্ভ করল সে। কিন্তু অসাড় আঙুলগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করল ওর সাথে। ফসকে পড়ে গেল কলমটা হাত থেকে। চোখা মাথাটা নিচের দিক হয়ে পড়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা তুষারের মধ্যে। রানা বুঝল, ওটাকে খোঁজা এখন বৃথা—সময় নেই।

জুতোর শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা। ট্রিগার-গার্ডের মধ্যে দিয়ে একটা অসাড় আঙুল ঢুকিয়ে নিল সে, তারপর গাছের গায়ে ঠেকাল পিস্তলটা। কাঁপুনি

থামাবার জন্যে চেপে ধরল কব্জিটা গাছের গায়ে। বাম হাতে বেল্টে বাঁধা খাপ থেকে থ্রোয়িং নাইফটাও বের করে রাখল—কাজে লাগতে পারে। রাইফেল হাতে সতর্ক পায়ে এগিয়ে আসছে সেন্ট্রি চারজন। রানা ভাবল, নলটা বন্ধ হয়ে আছে, প্রথম গুলিটা কি বরফ সুদ্ধ বেরিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করে ফেলবে নল, না, ব্যারেল ফাটিয়ে ওর হাতটা উড়িয়ে দেবে? বলা যায় না। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে।

হঠাৎ চোখ পড়ল রানার, আরও পেছনে আরও চারজন সেন্ট্রি বাঁকিটা ঘুরে মার্চ করে এগিয়ে আসছে এদিকে। হাতে সাব-মেশিনগান। জিভটা শুকিয়ে এল রানার। আটজন সেপাই আর চারটে কুকুরকে ঠেকাবে সে কি করে? মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা চলছে। শুকনো জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট দুটো ভিজাবার চেষ্টা করল। এখন গুলি করা আর আত্মহত্যা করা এক কথা। কাজটা বাকিই আছে এখনও। তিন মাস স্পেশাল ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো হয়েছে ওকে। পাকিস্তানের তরফ থেকে এই শেষ চেষ্টা। বন্দী হলেও সুযোগ হয়তো আসতে পারে, কিন্তু অনর্থক খুন হয়ে গেলে ডক্টর সেলিমকে আর পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে না।

ক্যাপ খুলে ছুরিটা চাঁদির ওপর রাখল রানা, আবার পরে নিল টুপিটা, তারপর সেফটি ক্যাচ তুলে দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল ওর ওয়ালথারটা সেন্ট্রিদের পায়ের কাছে। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে এল সে দুই হাত মাথার ওপর তুলে।

পুলিস ব্লকের ছোট্ট ঘরটা পর্যন্ত চুপচাপ এসে দাঁড়াল ওরা। মাঝে কোনও ঘটনা নেই। রানা ভেবেছিল রাইফেলের কুঁদোর বাড়ি আর লোহার স্পাইক লাগানো জুতোর অকৃপণ লাথিতে শুয়ে পড়তে হবে ওকে পথের ওপর, নিদেনপক্ষে কিছু কিল, চড় আর কনুইয়ের গুঁতো তো জুটবে প্রথমেই—কিন্তু তা হলো না। যেন রীতিমত ভদ্রতা করছে এমনভাবে নিয়ে চলল ওরা রানাকে পুলিস ব্লকে। যেন রানার ওপর কারও কোনও রাগ নাই—এমন কি রানার প্রচণ্ড ঘুসির ফলে যে লোকটা রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে আছে এখনও, তারও না। অন্য কোনও অস্ত্র আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখেছে একজন। কেউ একটা প্রশ্নও করেনি। রানার কাগজপত্র দেখতে চায়নি। অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করল রানা ভয়ানকভাবে।

লুকিয়ে যে ট্রাকটার পেছনে উঠে এতদূর এসেছে রানা সেটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এখনও। ড্রাইভারটা দুই হাত নেড়ে যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে একজন সেন্ট্রির কাছে। নিশ্চয়ই রানার উপস্থিতির ব্যাপারে ওর কোনও হাত আছে বলে ধরে নিয়েছে এরা। থেমে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে বিপদমুক্ত করবার জন্য কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, সুযোগ হলো না। হেডকোয়ার্টার এসে গেছে—দু'জন সিপাই দু'পাশ থেকে ধরল ওর হাত, পেছনের ধাক্কায় ঢুকে পড়ল সে দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর।

ঘরটা ছোট্ট। চারকোণা। এক কোণে ঘরটা গরম রাখার জন্যে একটা কাঠের চুলো। আসবাবের বিশেষ বালাই নেই। একটা ছোট নড়বড়ে ডেস্কের এপাশে দুটো চেয়ার, ডেস্কের ওপর টেলিফোন, ডেস্কের ওপারে মাঝবয়সী এক বেঁটেখাটো মোটা অফিসার-ইন-চার্জ বসে আছে। চেহারায় কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। কাশ্মীরীই হবে। পেটি অফিসারের ক্ষমতার ডাঁট প্রকাশ পাচ্ছে হাব-ভাবে। রানা বুঝল অত্যন্ত দুর্বল চরিত্রের লোক এই অফিসার-ইন-চার্জ। নিজের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যেই

কর্তৃত্বের খোলস পরে হম্বিতম্বি করে। ওপরওয়ালার পা চাটতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবে না এই লোক।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল রানা সেপাইদের কাছ থেকে, লম্বা দুই-তিন পা ফেলে পৌঁছল ডেস্কের কাছে, ধাঁই করে এক কিল বসাল ডেস্কের ওপর। নড়বড়ে টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠল টেলিফোনটা। টিং করে শব্দ হলো একটা।

'অফিসার-ইন-চার্জ কে? আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা কর্কশ কণ্ঠে।

মোটা লোকটা চমকে উঠেছিল ভয় পেয়ে। চট করে পেছনে সরে একটা হাত তুলতে যাচ্ছিল আত্মরক্ষার জন্যে—সামলে নিল। কিন্তু ওর লোকজন যে ওর এই আৎকে ওঠা দেখে ফেলেছে সেটা বুঝতে পেরে কান দুটো লাল হয়ে উঠল ওর।

'নিশ্চয়ই। আপনার কি মনে হয়?' উত্তর দিল সে।

'এইসব গুণ্ডামির কি অর্থ আমি জানতে চাই।' চট্ করে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে পাস এবং আইডেন্টিফিকেশন পেপার বের করল রানা। তারপর ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর।

'এগুলো পরীক্ষা করে দেখুন। ফটো আর টিপসই মিলিয়ে দেখুন। নিন, জলদি করুন, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, সারারাত আপনার সাথে গ্যাজর গ্যাজর করলে আমার চলবে না। কই, নিন, তাড়াতাড়ি করুন।'

রানার এই আত্মবিশ্বাস আর তেজ দেখে একটু যেন দমে গেল মোটা অফিসার-ইন-চার্জ। ধীরে ধীরে কাগজগুলো তুলে নিল টেবিলের ওপর থেকে।

'সুখলাল রাও, বর্ন ক্যালকাটা, জার্নালিস্ট, স্পেশাল করেস্পণ্ডেন্ট অফ দ্য স্টেটসম্যান।' জোরে জোরে পড়ল অফিসার-ইন-চার্জ।

'এবং এখন ফিরছি রাওয়ালপিণ্ডি থেকে। শ্রীনগরের ইন্টারন্যাশনাল সাইন্টিফিক কনফারেন্স কাভার করে ব্যাক টু ক্যালকাটা।' এবার একটা চিঠি ফেলল সে টেবিলের ওপর। পাকিস্তান ও ভারতের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীদ্বয়ের এক বিশেষ বৈঠকে ভারতের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সাংবাদিক সুখলাল রাওকে যোগদানের জন্যে লেখা অনুরোধ পত্র। মিনিস্ট্রির অফিশিয়াল সীলমোহর।

পা বাধিয়ে ডেস্কের কাছে টেনে আনল রানা একটা চেয়ার। তাতে আরাম করে বসে প্রায় আপন মনে বলল, 'আজকের এই ঘটনা, আপনার সুপিরিয়র অফিসারের ওপর কি রকম প্রতিক্রিয়া করবে নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন। আপনার প্রমোশনটা বোধহয় এবার আর হলো না।'

চট্ করে চাইল সে একবার রানার দিকে। খামের মধ্যে ভরে রাখল চিঠিটা। রানা লক্ষ করল, মুখের চেহারাটা স্বাভাবিক দেখালেও অল্প অল্প কাঁপছে হাত দুটো। নিজের হাতের দিকে চেয়ে থাকল লোকটা অল্পক্ষণ, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে। 'পালিয়ে গিয়েছিলেন কেন?'

'হায়, ভগবান!' রানা এ প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে ফেলেছে আগেই। 'রাতের অন্ধকারে সশস্ত্র ডাকাত পড়ল গাড়িতে, এই অবস্থায় আপনি হলে কি করতেন? বসে বসে খুন হতেন ওদের হাতে?'

'ওরা পুলিসের লোক ছিল। আপনি...'

'নিশ্চয়ই ওরা পুলিসের লোক,' বাধা দিয়ে বলল রানা তিক্ত কণ্ঠে। 'সেটা

এখন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু অন্ধকারে আমি সেটা দেখতে পাইনি। পাওয়ার কথাও নয়।'

সামনের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে শান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে আছে রানা। মাথার ভেতর চলছে দ্রুত চিন্তা। তাড়াতাড়ি এইসব কথোপকথন শেষ করতে হবে। মোটা লোকটা হাজার হোক পুলিস অফিসার। যতটা বেকুব দেখাচ্ছে, নিশ্চয়ই ততখানি বেকুব ও নয়। যে-কোন মুহূর্তে কোনও বেয়াড়া প্রশ্ন করে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। রানা ভাবল, এখন আক্রমণ না করে দয়া-কৃপা-ক্ষমা ইত্যাদি বর্ষণ করলে কাজ হতে পারে। গলা থেকে তিক্ত ভাবটা চলে গেল ওর। তার জায়গায় এল বন্ধুত্বের আভাস।

'দেখুন, যা হবার হয়ে গেছে। ভুলে যান। আমার মনে হয় না দোষটা আপনার। আপনারা আপনাদের ডিউটি করেছেন মাত্র। আসুন, এক কাজ করা যাক, আপনি আমাকে শ্রীনগর পর্যন্ত পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দিন, আমি তার বদলে আজকের ঘটনাটা বেমালুম ভুলে যাব। এসব কথা আমার পেপারেও যাবে না, মিনিস্ট্রিতেও যাবে না, আপনার ওপর-ওয়ালাদের ওপরেও চাপ আসবে না। কি, রাজি?'

'অনেক ধন্যবাদ। খুবই দয়ালু লোক আপনি,' রানা যে উৎসাহ আশা করেছিল তার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পেল না অফিসারের কণ্ঠে। বরং যেন তীক্ষ্ণ একটা টিটকারির আভাস পাওয়া গেল। ওর ক্ষুদ্র দুই চোখের দিকে চেয়েই রানা নিজের ভুল বুঝতে পারল। এ লোক সহজ পাত্র নয়। 'কিন্তু একটা কথা বলুন দেখি মিস্টার রাও, ট্রাকের মধ্যে আপনি কেন? আপনার মত একজন স্বনামধন্য সাংবাদিকের পক্ষে ড্রাইভারকে না জানিয়ে চুপি চুপি ট্রাকের পেছনে উঠে এই শীতের রাতে শ্রীনগর যাওয়া কি একটু অস্বাভাবিক নয়?'

'ওকে বললে ও আমাকে না-ও নিতে পারত। প্যাসেঞ্জার নেয়া ওদের নিষেধ আছে। কিন্তু আজই আমার পৌঁছতে হবে শ্রীনগরে।' রানা বুঝল ফাঁদে পা দিচ্ছে সে। খুব সাবধান থাকতে হবে। একটা কথা এদিক-ওদিক হলেই সব খতম হয়ে যাবে।

'কিন্তু কেন...'

'ট্রাকে কেন?' কথাটা শেষ করতে দিল না রানা, 'রাস্তাটার অবস্থা তো জানেনই। বরফের ওপর স্কিড করে পড়েছিলাম নিচু গর্তে, আমার অ্যামব্যাসাডরের ফ্রন্ট অ্যাক্সেল দু'টুকরো হয়ে গেছে। ছ'মাইল পশ্চিমে পড়ে আছে ওটা এখনও ডিচের মধ্যে।'

'রাওয়ালপিণ্ডি থেকে আপনি গাড়ি করে আসছিলেন?'

'কেন, দিল্লী থেকে রাওয়ালপিণ্ডি গাড়ি করে যেতে পারলাম, ওখান থেকে শ্রীনগর আসতে পারব না?' রাগের ভান করল রানা। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু, এসব প্রশ্ন অপমানকর। আমার কাগজপত্র আপনি দেখেছেন। বার বার বলছি আমার তাড়া আছে। অযথা দেরি না করিয়ে আমার যাবার ব্যবস্থাটা করে দিন দয়া করে।'

'আর মাত্র দুটো প্রশ্ন। তারপরই আপনার শ্রীনগর পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি।' চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসল অফিসার-ইন-চার্জ। দুশ্চিন্তায় ভরে গেল রানার

মন। 'রাওয়ালপিণ্ডি থেকে সোজা আসছেন আপনি?'

'সোজা কাকে বলছেন আপনি? পালান্দরী, পুঞ্চ, উরি, রামপুর, বারামুলা হয়ে আসছি।'

'কখন রওনা হয়েছেন, সকালে?'

'না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর।'

'কয়টা? দশ, এগারো?'

'না। চারটের দিকে।'

'তাহলে বর্ডার ক্রস করেছেন সাড়ে পাঁচটায়?'

মাথা নাড়ল রানা।

'তারপর পথে কোথাও না থেমে সোজা চলে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সোজা এসেছি।'

'আগাগোড়া রাস্তা ঠিক ছিল?'

এইবার রানা একটু ঘাবড়ে গেল। আসলে সে ওই রাস্তায় আসেইনি। ও এসেছে মুজাফফরাবাদ হয়ে। কিন্তু এখন আর কথা উল্টানো যায় না।

'নিশ্চয়ই। নইলে এলাম কি করে?'

'আপনি শপথ করে বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দরকার হলে শপথ করতে পারি বই কি।'

মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকল অফিসারের, চোখ দুটো দ্রুত এদিক ওদিক নড়ল। রানা বিস্মিত হলো। কিন্তু একটু নড়াচড়া করবার আগেই দু'জোড়া হাত খপ্ করে ধরে ফেলল রানার দুই হাত। টেনে দাঁড় করিয়ে হাত দুটো জোড়া করে একটা স্টীলের হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দেয়া হলো ওর হাতে।

'এসবের কি অর্থ?' তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অর্থ হচ্ছে একমাত্র মিথ্যাবাদীই এত শিওর হয়ে কথা বলতে পারে।' স্বাভাবিকভাবে কথা বলবার চেষ্টা করল অফিসার, কিন্তু আত্মপ্রসাদ আর গর্বের ভাব প্রকাশ পেয়ে গেল কণ্ঠে। 'তোমার জন্যে একটা সংবাদ আছে, সুখলাল রাও, অবশ্য তোমার নাম যদি তাই হয়—গতকাল উরি-পুঞ্চের রাস্তার ব্রিজ ভেঙে পড়ায় সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে আছে। অথচ আজ তুমি সেই রাস্তায় সোজা চলে এসেছ, তাই না?' একহাতে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল অফিসার। মুখে সুবিস্তৃত হাসি। ডায়াল করার আগে রানার দিকে ফিরে বলল, 'শ্রীনগরে পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, বাছাধন। পুলিস ভ্যানে চড়ে সোজা শ্রীনগরের শ্রীঘরে চলে যাবে। বেশ কিছুদিন পাকিস্তানী স্পাই ধরা পড়েনি। খবর পেলেই মহানন্দে ধেয়ে আসবে ওরা শ্রীনগর থেকে।'

রিসিভারটা কানে লাগিয়েই ভুরু কুঁচকে গেল অফিসারের। নামিয়ে রেখে আবার তুলল। কয়েকবার টোকা দিল ক্রেডলের ওপর। তারপর বিরক্ত হয়ে রেখে দিল ওটা যথাস্থানে।

'আবার গেছে নষ্ট হয়ে। যখন-তখন আউট অফ অর্ডার!' নিজের মুখে খবরটা ঘোষণা করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে একটু হতাশ দেখাল ওকে। ইশারায় একজন সিপাইকে কাছে ডাকল সে।

'কাছাকাছি কোথায় টেলিফোন আছে?'

'পোস্ট অফিসে। এখান থেকে দুই মাইল।'

'যত তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও সেখানে।' একটা কাগজে কিছু লিখল সে খসখস করে। 'এই যে নম্বর। আর এই মেসেজ।' আবার লিখল। 'খবরটা যে আমি পাঠাচ্ছি সেটা পরিষ্কার করে আগে বলবে, তারপর মেসেজ দেবে। যাও, জলদি!'

'কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ফেলল সেপাই। গলা পর্যন্ত ওভারকোটের বোতাম লাগিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার আগেই খোলা দরজা দিয়ে এক নজর চেয়ে রানা দেখল এইটুকু সময়ের মধ্যেই মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ—তুষার পড়তে আরম্ভ করেছে বাইরে। ফিরে চাইল সে অফিসারের দিকে।

'আপনি বুঝতে পারছেন না কী ভুল করছেন। আপনার কপাল মন্দ, আমার আর কিছুই বলবার নেই,' বলল রানা।

'এখনও ভণ্ডামি হচ্ছে! তুমি ভেবেছ তোমার একটি কথাও আমি বিশ্বাস করেছি?' ঘড়ির দিকে চাইল সে। 'ঘণ্টা দেড়েক-দু'য়েক লাগবে তোমার জন্যে গাড়ি পৌঁছতে। এই সময়টুকু আমরা সৎকাজে ব্যয় করতে পারি। নাও, আরম্ভ করো। তোমার নাম?'

'আমার নাম আমি বলেছি। আমার কাগজপত্রও আপনি দেখেছেন। এর প্রতিটা অক্ষর সত্য। আপনাদের খুশি করবার জন্যে দেখছি এখন মিছে কথা বলতে হবে!'

কারও অনুমতি ছাড়াই আবার চেয়ারের ওপর বসে পড়ল রানা। হ্যাণ্ডকাফের ওপর একবার চোখ বুলাল—না, অত্যন্ত শক্ত, এদিকে কোনও সুবিধে হবে না। হাত বাঁধা অবস্থাতেও সে মোটুকে খুন করে ফেলতে পারে এক মিনিটের মধ্যে। মাথার ওপর ছুরি রয়েছে ওর। কিন্তু পেছনের তিনজন সেপাই? নাহ, সে-চেষ্টা করে লাভ নেই।

'মিছে কথা বলতে কে বলেছে তোমাকে? স্মরণশক্তিটা একটু ধার দিয়ে নাও, তাহলেই হবে। তার জন্যে খানিকটা ওষুধ লাগবে, তাই না?'

উঠে দাঁড়াল অফিসার। ডেস্কটা ঘুরে রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'কই? তোমার নাম?'

'আমি তো বলেইছি,' চমকে উঠে থেমে গেল রানা। খুব দ্রুত দুটো থাবড়া লাগাল অফিসার রানার গালে। একবার সোজা, একবার উল্টো। হাতের আংটি দিয়ে কেটে গেল রানার ঠোঁটের কোণা। হ্যাণ্ডকাপ লাগানো হাত দুটো তুলে হাতের পেছন দিয়ে খানিকটা রক্ত মুছে ফেলল সে। মুখের ভাবে কোনও পরিবর্তন হলো না ওর।

'আবার একবার ভেবে দেখো, খোকা। অনর্থক বোকামি না করে বলে ফেলো। অনেক কথা জানবার আছে—একটা কথা নিয়ে আর কতক্ষণ ধস্তাধস্তি করবে?'

একটা জঘন্য অশ্লীল গালি বেরিয়ে এল রানার মুখ থেকে। লাল হয়ে গেল অফিসারের মুখ। এক পা এগিয়ে এল সে ঘুসি পাকিয়ে, পরমুহূর্তেই চিৎ হয়ে পড়ল নড়বড়ে ডেস্কের ওপর, মড়াৎ করে সেটার পায়া মচ্‌কে পড়ল মাটিতে। দড়াম করে

বেকায়দা মত এক লাথি লাগিয়ে দিয়েছে রানা। গোঁ-গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে ওর মুখ দিয়ে তীব্র ব্যথায়। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে লোকটা, বিকৃত হয়ে গেছে ওর মুখ। কয়েক সেকেণ্ড ওই ভাবেই রইল মাটিতে, মচকানো টেবিলের পায়া আঁকড়ে ধরে উঠবার চেষ্টা করল তারপর। সেপাইগুলো এই আকস্মিক ঘটনায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বোকার মত। ঠিক এমনি সময়ে ঝটাং করে খুলে গেল পেছনের দরজা। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে।

পেছন ফিরে চাইল রানা। দেখল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক লোক, তীক্ষ্ণ নীল দুই চোখ সারাটা ঘর একবার ঘুরে স্থির হলো এসে রানার চোখে। চমৎকার সুপুরুষ চেহারা, চওড়া কাঁধ, কোমরে বেল্ট বাঁধা, হাঁটুর নিচ পর্যন্ত লম্বা একটা মিলিটারি ট্রেঞ্চ-কোট পরা, পায়ে গাম-বুট। খাড়া নাক, ঘন কালো ভুরু, জুলফিটা কাঁচাপাকা। বয়স পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ। চাউনি দেখেই বোঝা গেল, এ-লোক আদেশ করতেই অভ্যস্ত, আদেশ পালন করতে নয়।

দুই সেকেণ্ডে সম্পূর্ণ অবস্থাটা বুঝে নিল লোকটা। রানা টের পেল, দুই সেকেণ্ড এই লোকের জন্যে যথেষ্ট। ঘরের অবস্থা দেখে একবিন্দুও অবাক হলো না লোকটা। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে টেনে তুলে খাড়া করে দিল সে অফিসার-ইন-চার্জকে।

'গর্দভ কোথাকার!' লোকটার গলার স্বরে তীক্ষ্ণ তিরস্কার। 'ভবিষ্যতে কাউকে কিছু প্রশ্ন করতে হলে তার পায়ের ব্যাপারে সাবধান থাকবে।' রানার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'কে ওই লোকটা? কি জিজ্ঞেস করছিলে তুমি ওকে, এবং কেন?'

রানার দিকে চাইল অফিসার, যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওর নাম সুখলাল রাও, জার্নালিস্ট—আমি বিশ্বাস করি না সে-কথা। ও একটা পাকিস্তানী স্পাই। পাকিস্তানী কুত্তা।'

'তা ঠিক, সব স্পাই-ই কুকুর। কিন্তু আমি তোমার মতামত শুনতে চাই না, আমি চাই তথ্য। প্রথম কথা, ওর নাম জানলে কি করে?'

'ও-ই বলেছে, ওর কাগজপত্রেও তাই লেখা। ওগুলো সব জাল।'

'দেখি?' বাম হাতটা সামনে বাড়াল আগন্তুক।

পুলিস অফিসার এখন একটু সুস্থ বোধ করছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মচকানো টেবিলের দিকে দেখাল। 'ওই তো ওখানে।'

'দেখি?' ঠিক একই সুরে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করল সে কথাটা। হাতটা তেমনি সামনে বাড়ানো। কাগজগুলো নিয়ে ওর হাতে দিল অফিসার।

'চমৎকার!' কাগজ উল্টেপাল্টে দেখল আগন্তুক। 'একেবারে খাঁটি দেখাচ্ছে। কিন্তু ঠিকই ধরেছ তুমি, এ-সবকিছু নকল। যাক, পেয়ে গেছি, এ লোক আমাদের।'

রানা বুঝল অত্যন্ত ধূর্ত ও ভয়ঙ্কর এই লোকটা। একশোটা পুলিসের চেয়েও ভয়ঙ্কর। একে ধোঁকা দেয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

'আপনাদের লোক? কি বলতে চান আপনি?' কথাটা বেরিয়ে গেল অফিসারের মুখ থেকে।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি বলছ, লোকটা স্পাই। কেন?'

'ও বলছে ও পুঞ্চ উরি হয়ে আজ আসছিল গাড়িতে চড়ে···'

'অথচ ব্রিজটা গতকাল ভেঙে গেছে এই তো?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল আগন্তুক। দেয়ালে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল সে একটা। চিন্তিত মুখে চেয়ে রইল রানার দিকে। আনমনে টানতে থাকল সিগারেটটা চুপচাপ। এবারে নীরবতা ভঙ্গ করল পুলিস অফিসার। এতক্ষণে সে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে আবার—সেই সাথে ফিরে এসেছে সাহস।

'আপনি আমাকে হুকুম করবার কে?' হঠাৎ চটে উঠল সে। 'আমি এখানকার অফিসার-ইন-চার্জ। আপনাকে চিনি না জানি না, আপনি কোত্থেকে উড়ে এসে মাতব্বরি মারতে লেগেছেন?'

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে রানার চেহারা আর কাপড়-চোপড় লক্ষ করল আগন্তুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর আলস্য ভরে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে চাইল সে অফিসারের দিকে। মুখে সেই নিরাসক্ত ভাব। ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠল অফিসার, নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল এক পা।

'তুমি যে কথাটা বললে এবং যে ভাবে বললে তার জন্যে আপাতত আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম।' বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে রানার দিকে ইঙ্গিত করল আগন্তুক। 'লোকটার ঠোঁট কেটে গেছে দেখছি। গ্রেফতার করবার সময় বাধা দিয়েছিল?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল না, তাই…'

'কোন অধিকারে তুমি জখম করেছ ওকে? তোমাকে প্রশ্ন করবারই বা অধিকার দিয়েছে কে?' ধমক তো নয় যেন চাবুক পড়ল পুলিস অফিসারের পিঠে। 'হতচ্ছাড়া, পাজি, গর্দভ কোথাকার! জানো তুমি, কতখানি ক্ষতি হয়ে যেতে পারত? ভবিষ্যতে নিজের ক্ষমতার সীমা যদি লঙ্ঘন করো, আমি নিজে তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করব। গেঁয়ো, মূর্খ, ভূত কোথাকার!'

দুই চোখে আতঙ্কের ছায়া পড়ল পুলিস অফিসারের। শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিল একবার।

'আমি, আমি চিন্তা করেছিলাম…'

'চিন্তা ভাবনাটা যোগ্য ব্যক্তির জন্যে তুলে রেখো। ওটা তোমার মত গর্দভের কর্ম নয়।' আরেকবার বুড়ো আঙুল দিয়ে রানার দিকে ইঙ্গিত করল আগন্তুক। 'এই লোকটাকে এখান থেকে বের করে আমার গাড়িতে তুলে দাও। ওকে সার্চ করা হয়েছে ঠিক মত?'

'নিশ্চয়ই,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল পুলিশের ও. সি.। 'ভালভাবে সার্চ করা হয়েছে—আগাগোড়া।'

'তোমার এই কথা কতখানি নির্ভরযোগ্য তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।' রানার দিকে চেয়ে ডান ভুরুটা একটু ওপরে ওঠাল আগন্তুক। বলল, 'আমার কি নিজের হাতে একবার সার্চ করতে হবে, না কোনও অস্ত্র থাকলে নিজেই বের করে দিয়ে আমাকে এই গ্লানিকর কাজ থেকে রেহাই দেবেন।'

'আমার টুপির তলায় ছুরি আছে একটা।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' টুপি উঠিয়ে ছুরিটা তুলে নিল আগন্তুক, তারপর যথেষ্ট ভদ্রতার সাথে আবার টুপিটা রাখল রানার মাথার ওপর। বোতাম টিপতেই সড়াৎ করে খুলে গেল স্প্রিং-লোডেড ছুরি। তীক্ষ্ণ ধার দেয়া ব্লেডটা পরীক্ষা করে দেখল

সে একবার, ছুরিটা ভাঁজ করে রাখল কোটের পকেটে, তারপর ফিরে চাইল পুলিস অফিসারের রক্তশূন্য মুখের দিকে।

'এমন করিৎকর্মা লোক তুমি—প্রমোশন তোমার ঠেকায় কে!' ঘড়ির দিকে চাইল সে একবার। 'যাক, রওনা হতে হবে এখন। আচ্ছা! তোমার এখানে টেলিফোন আছে দেখছি। আমাকে হেডকোয়ার্টার এ-আরবিকে-র লাইন দাও—জলদি।'

চমকে উঠল রানা। যদিও ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছিল রানার কাছে লোকটার পরিচয়, তবু নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে সত্যিই চমকে উঠল সে। ইণ্ডিয়ান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের বাছাই করা সেরা লোকদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে এই অ্যান্টি রেভোলিউশন ব্যুরো অফ কাশ্মীর। কাশ্মীরী বিপ্লবীদের দমন করবার জন্যে এদের হাতে প্রচণ্ড ক্ষমতা দিয়েছে ভারত সরকার। এদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী ঢাকায় বসেও শুনেছে সে বহুবার। সেই এ-আরবিকে-র ভয়াবহ হেডকোয়ার্টার। হাজার হাজার আজাদীকামী কাশ্মীরী মুসলমান প্রাণ দিয়েছে এদের চাবুকের মুখে। এদেরই হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাচ্ছে ওকে!

'বাহ্! দেখছি নামটা আপনার কাছে অপরিচিত নয়?' আগন্তুক হাসল। 'পাকিস্তান থেকে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে এসেছেন দেখছি।' হঠাৎ ঘুরল সে পুলিস ইন্সপেক্টরের দিকে, 'কি? তোমার কি হলো আবার?'

'টেলিফোনটা খারাপ হয়ে আছে, স্যার।'

'তা তো হবেই। কোনও দিক থেকেই তোমার কোনও তুলনা হয় না।' পকেট থেকে একটা আইডেন্টিটিকার্ড বের করে পুলিস অফিসারের চোখের সামনে ধরল সে কয়েক সেকেণ্ড। 'তোমার বন্দীকে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে এই পরিচয়ই তো যথেষ্ট, তাই না?'

'নিশ্চয়ই কর্নেল, নিশ্চয়ই। আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

'বেশ!' কার্ডটা পকেটে রেখে রানার দিকে ফিরল আগন্তুক। বলল, 'কর্নেল সুবান্দ্রিও অফ এ-আর. বি. কে. অ্যাট ইয়োর সার্ভিস, স্যার। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আপনার জন্যে। এক্ষুণি শ্রীনগর ফিরে যাচ্ছি আমরা। আমি এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ কয়েক সপ্তাহ ধরেই আপনার জন্যে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলাম। চলুন কিছু আলাপ-আলোচনা করা যাবে।'

দুই

রানার সুটকেসটা কর্নেল সুবান্দ্রিওর নির্দেশে ট্রাকের পেছন থেকে নিয়ে আসা হলো, গাড়ির পেছনের সীটে রাখা হলো সেটা। পিস্তলটা রেখে দিল কর্নেল পকেটে। কালো শেভ্রোলে গাড়ি এখন সাদা তুষারাচ্ছন্ন হয়ে আছে সামনেটুকু ছাড়া। এঞ্জিনের ওপরের বনেটটা গরম হয়ে আছে বলে তুষার জমতে পারছে না, গলে পড়ে যাচ্ছে নিচে।

রানাকে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসানো হলো। তারপর হাত-পা বুক-পেট নিপুণ হাতে আচ্ছা করে বেঁধে ফেলা হলো গাড়ির বডির সাথে ফিট করা লোহার চেন দিয়ে। একচুলও বাড়তি নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না আর।

'গাড়িতে আমরা একটু বিশেষ ব্যবস্থা রাখি, তা অবশ্য যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্যেই,' বিনয় করে বলল কর্নেল। 'আমার যাত্রীদের অনেকের আবার আত্মহত্যার নেশায় পেয়ে বসে, কিছুতেই হেডকোয়ার্টারে যেতে চায় না।' বাঁধা শেষ করে বলল, 'আরাম করে বসে যেতে পারবেন, একটু-আধটু নড়াচড়াও করতে পারবেন, কিন্তু আমার নাগাল পাবেন না হাজার চেষ্টা করলেও। দরজা খুলে লাফিয়েও পড়তে পারবেন না, কারণ লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন আপনার দিকের দরজা খোলার হাতলটা নেই। আর শিকল ছেঁড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে আমি মানাই করব, কারণ···আরে, তুমি আবার কি চাও?'

'আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, কর্নেল, আমাদের শ্রীনগর স্টেশনে এই লোকটার জন্যে গাড়ি পাঠাবার মেসেজ দিয়েছিলাম,' ভয়ে ভয়ে বলল পুলিস অফিসার।

'তাই নাকি? কখন?'

'পনেরো-বিশ মিনিট আগে।'

'বুদ্দু, কাহিঁকে! আমাকে আগেই বলা উচিত ছিল সে-কথা। যাক, ক্ষতি নেই কোনও। তোমার নিজের বোকামির জন্যে নিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু গালাগালিও উপরি-পাওনা হিসেবে উপার্জন করে রাখলে আর কি।'

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে কার্টসি লাইটটা জ্বেলে দিল কর্নেল, যাতে রানার কার্যকলাপ পরিষ্কার দেখা যায়, তারপর ছুটল গাড়ি শ্রীনগরের পথে। গাড়ির চারটে চাকাতেই স্নো-টায়ার লাগানো। দক্ষ হাতে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে সুবান্দ্রিও, নীল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মাঝে মাঝে রাস্তা ছেড়ে চট্ করে ঘুরে যাচ্ছে রানার ওপর দিয়ে।

স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে রানা। কর্নেলের নিষেধ সত্ত্বেও শিকলগুলো অলক্ষে পরীক্ষা করে দেখেছে সে ইতোমধ্যেই। অসম্ভব। এবার মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চেষ্টা করল। মানুষের জীবনে দৈব-ঘটনা ঘটে। রানার জীবনেই ঘটেছে কতবার। কিন্তু সে অন্য ধরনের। তবে এ-আরবিকে হেডকোয়ার্টারের টরচার চেম্বার থেকে আজ পর্যন্ত কেউ কখনও রক্ষা পায়নি। রানা জানে, সে-ও পাবে না। একবার ঢুকলে সব আশা শেষ। যদি পালাতে হয়, তাহলে এই গাড়ি থেকেই পালাতে হবে। এবং এক ঘন্টার মধ্যেই।

জানালার কাঁচ তুলবার-নামাবার হ্যাণ্ডেলটা নেই। থাকলেই বা কি হত—জানালা খোলা থাকলেও তো সে বাইরের হ্যাণ্ডেল পর্যন্ত হাত বাড়াতে পারত না। স্টিয়ারিং-এও পৌঁছবে না ওর হাত, মনে মনে হিসেব করে দেখেছে সে, অন্ততপক্ষে ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক থাকবে চেষ্টা করতে গেলে। পা দুটো কিছুদূর নড়ানো যাচ্ছে, কিন্তু লাথি দিয়ে সামনের উইণ্ডস্ক্রীন ভেঙে দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানোর কোনও বন্দোবস্ত নেই। অত উঁচুতে উঠানো যাচ্ছে না পা। মাথার মধ্যে রানার চিন্তা আসছে একটার পর একটা, রাস্তার পাশের ল্যাম্পপোস্টগুলোর মতন,

তারপর হারিয়ে যাচ্ছে পেছনে। পথ খুঁজে পাচ্ছে না রানা। তাছাড়া কোনও উপায় বের না করে মূর্খের মত কিছু একটা করে বসা ঠিক হবে না, বুঝল রানা। তাহলে কানের পেছনে পিস্তলের বাঁটের একটা টোকা মেরে ঘুম পাড়িয়ে দেবে চতুর কর্নেল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই পৌঁছে যাবে হেডকোয়ার্টারে। এমন অসহায় অবস্থায় পড়ে ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল ওর।

আচ্ছা, পকেটে কি কি আছে? এমন কিছু কি নেই যা ব্যবহার করা যায়? শক্ত কিছু, যেটা মাথায় ছুঁড়ে মেরে ব্যাটাকে বেহুঁশ করে গাড়িটা ধাক্কা খাওয়ানো যায়? অ্যাক্সিডেন্ট হলে অবশ্য সে-ও জখম হতে পারে, কিন্তু আগে থেকে সাবধান থাকলে না-ও হতে পারে। হ্যাণ্ডকাফের চাবিটা কোথায় রাখা হয়েছে ও জানে। কাজেই···

কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিন্তা করে দেখল রানা ওর পকেটে পয়সা ছাড়া শক্ত কিছুই নেই। জুতো? একটা জুতো খুলে চেষ্টা করে দেখবে নাকি? নাহ্, হাতটা পৌঁছবে না পা পর্যন্ত। আরেকটা কথা চট করে মাথায় এলো রানার—এতে বাঁচবার কিছু সম্ভাবনা থাকতে পারে। ঠিক এমনি সময়ে কথা বলে উঠল কর্নেল।

'আপনি দেখছি ভয়ঙ্কর লোক, মশাই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিন্তা করেন আপনি, মি. রাও।'

রানা কোন জবাব দিল না।

'এত ভয়ঙ্কর আর এত দৃঢ়সংকল্প মানুষ আর চাপেনি আগে ওই সীটে। কোথায় চলেছেন আপনি জানেন, অথচ পরোয়া নেই কোনও।'

এবারও কোন জবাব দিল না রানা। মাথার মধ্যে একটু আগের সেই প্ল্যানটা ঘুরছে ওর। বিপদ আছে, কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনাও আছে। ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

'চুপ করে রইলেন যে?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলল জানালা দিয়ে বাইরে। রানা বুঝল এ-ই সুযোগ। 'কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনার?'

'না তেমন কিছু নয়,' বলল রানা। 'তবে একটা সিগারেট হলে মন্দ হত না।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলল সুবান্দ্রিও। 'আপনার সামনে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে সিগারেট আছে। অতিথিদের জন্যেই এগুলো রাখা। বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করুন।'

'ধন্যবাদ।' ড্যাশবোর্ডের ওপর উঁচু একটা জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে রানা জিজ্ঞেস করল, 'লাইটার না ওটা?'

'হ্যাঁ, ব্যবহার করুন।'

দুই হাত সামনে বাড়িয়ে ওটা টিপে ধরল রানা কয়েক সেকেণ্ড, তারপর বের করে আনল লাইটারটা, লাল হয়ে আছে মাথাটা। সিগারেটটা ধরাতে যাবে এমন সময় হাত থেকে ফস্কে পড়ে গেল সেটা মেঝেতে। নিচু হয়ে ধরতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল হাতটা শিকলে বেধে।

হেসে উঠল সুবান্দ্রিও। সোজা হয়ে ফিরে চাইল রানা ওর মুখের দিকে। কর্নেলের হাসিতে বিদ্রূপ নয়, বরং প্রশংসা আছে।

'বাহ্, চমৎকার! আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক, মি. রাও। এবং ভয়ঙ্কর। এ ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হলাম আমি।' সিগারেটে লম্বা করে একটা টান দিল কর্নেল, তারপর বলল, 'আমার জন্যে তিনটে পথ এখন খোলা আছে, তাই না? কিন্তু দুঃখিত, তিনটে কাজের একটাও করব না আমি। চতুর্থ আরেকটা পথ বের করে নিয়েছি।'

'কি বলছেন কিছু বুঝতে পারছি না আমি,' বলল রানা।

আবার হেসে উঠল সুবান্দ্রিও। 'বিস্মিত হবার অভিনয়টাও চমৎকার হয়েছে। যা বলছিলাম, তিনটে পথ খোলা ছিল আমার। প্রথম, ভদ্রতা করে আমি নিচু হয়ে লাইটারটা তুলে দিতে পারতাম, আর নিচু হওয়া মাত্রই মাথার পেছনে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে জোরে আঘাত করে আপনি আমাকে অজ্ঞান করে ফেলতেন। আর হ্যাণ্ডকাফের চাবিটা কোথায় আছে তা-ও আপনার জানা আছে—না দেখার ভান করে খুব মনোযোগ দিয়ে আগেই লক্ষ করেছেন আপনি সেটা।'

যেন কিছুই বুঝতে পারছে না এমনিভাবে চাইল রানা ওর দিকে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে পরিষ্কার বুঝল, হেরে গেছে সে। ধরা পড়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, আমি ম্যাচ বাক্সটা ছুঁড়ে দিতে পারতাম আপনার দিকে। একটা কাঠি জ্বেলে বাকি সবগুলোর মাথায় আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারতেন সেটা আমার মুখের ওপর—ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে যেত গাড়ি ডিচের মধ্যে, তারপর কি হত কে জানে! অ্যাক্সিডেন্ট হলেও তো অনেকে বেঁচে যায়! আর তৃতীয়ত, আমি হয়তো একটা কাঠি জ্বেলে আপনার সিগারেটটা ধরিয়ে দিতে যেতাম—অমনি ফিঙ্গার জুডো, মড়মড় করে আমার আঙুলগুলো ভেঙে ফেলা, তারপর এগিয়ে এসে রিস্ট লক, ব্যস চাবিটা এসে যেত হাতের কাছে। অত্যন্ত দুর্ধর্ষ লোক আপনি, মি. রাও।'

'খামোকা বাজে বকছেন,' বলল রানা গম্ভীরভাবে।

'হতে পারে। আমার সন্দেহপ্রবণ মন। কিন্তু সন্দেহপ্রবণ বলেই টিকে আছি আজ পর্যন্ত। এই নিন, দেখুন আমার চতুর্থ পথটা পছন্দ হয় কিনা।' একটা ম্যাচের কাঠি ফেলল কর্নেল রানার কোলের ওপর। 'ওই লোহাটার ওপর ঘষলেই জ্বলে উঠবে কাঠি। ওটা দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিন।'

চুপচাপ সিগারেট ধরাল রানা। অভ্যেস নেই, কেশে উঠল ধোঁয়া টেনে। হঠাৎ জোরে ব্রেক কষে বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ের একটা সরু গলিতে চলে গেল কর্নেল। কিছুদূর গিয়ে বড় রাস্তার সাথে সমান্তরালভাবে গজ বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি তুষার ছাওয়া কয়েকটা ঝোপের আড়ালে। এঞ্জিন বন্ধ করে হেড লাইট অফ করে দিল সে। ডান ধারের জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে ফিরল রানার দিকে। কার্টসি লাইটটা কেবল জ্বলছে গাড়ির মধ্যে।

রানার সুটকেসটা খুলে ফেলল কর্নেল সুবান্দ্রিও রানার পকেট থেকে চাবি বের করে নিয়ে। নিপুণ হাতে একটা ক্যানভাস লাইনিং ছিঁড়ে বের করল কয়েকটা কাগজ—যেন জানাই ছিল ওর কোথায় কি আছে।

'বাহ্! একমুহূর্তে আপনার সমস্ত পরিচয় পাল্টে গেল, মি. রাও। নাম, জন্মস্থান, পেশা, সবকিছু। চমৎকার! দুই পরিচয়ের কোন্‌টা বিশ্বাস করতে বলেন?'

'আগেরটা জাল।' এইবার হিন্দি ছেড়ে কাশ্মীরী স্থানীয় উর্দু ভাষায় কথা বলে

উঠল রানা। 'লাহোরে আমার মা মৃত্যুশয্যায়, তাই জাল পরিচয়পত্র নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। এ-ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না।'

'আচ্ছা! তা আপনার মা...'

'মারা গেছেন,' শোকার্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন!' সশব্দে হেসে উঠল কর্নেল।

'কারও মায়ের মৃত্যু নিয়ে এভাবে ইয়ার্কি মারা আপনাদেরই সাজে,' আহত গলায় বলল রানা।

'আমি সেজন্যে দুঃখিত, মি. আবদুল্লাহ হারুন। আমি আসলে হাসছিলাম আপনার নির্ভুল শ্রীনগরী উর্দু শুনে। তাহলে শ্রীনগরেই জন্ম আপনার?'

'জী। আমার নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, সবকিছুই ঠিক ঠিক পাবেন শ্রীনগর মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে। এমন কি...'

'বুঝেছি, বুঝেছি,' একটা হাত তুলে বাধা দিল কর্নেল সুবান্দ্রিও। 'আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। এমন কি যে স্কুল-ডেস্কের ওপর ছোটকালে ব্লেড দিয়ে নিজের নাম খোদাই করেছিলেন সেটাও যে আপনি দেখাতে পারবেন তাতে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার এবং আপনার ওপর-ওয়ালাদের প্রশংসা না করে পারছি না। পাকিস্তান যে এত এগিয়ে গেছে কল্পনাতেও ছিল না আমার। সত্যি বলছি, রীতিমত হিংসেই হচ্ছে।'

'আপনি মিথ্যে আমাকে সন্দেহ করেছেন, কর্নেল। আমি সাধারণ একজন কাশ্মীরী। আমি জোরের সাথে একথা প্রমাণ করতে পারি। পরিচয় জাল করে অন্যায় করেছি আমি, স্বীকার করি, কিন্তু ওদিকে আমার মা মারা যাচ্ছে—সেদিকটা দেখবেন না আপনারা? আমার নিজের দেশের কোনও ক্ষতি তো আমি করিনি। আমি তো পাকিস্তানে পালিয়েই যেতে পারতাম, কিন্তু আমার সে ইচ্ছে নেই। আমার দেশ কাশ্মীর, আমার জন্ম এখানে, আমার দেশে আমি ফিরে এসেছি।'

'কি বললেন? দেশে ফিরে এসেছেন? আমি প্রমাণ করে দিতে পারি, জীবনে আপনি কখনও শ্রীনগরে যাননি, ফিরে আসা তো দূরের কথা।' রানার চোখে চোখে চেয়ে কথা বলছিল কর্নেল, হঠাৎ মুখের ভাব বদলে গেল, বলল, 'পেছনে কে?'

ঝট করে ঘুরে পেছনে চাইল রানা। ঘুরেই বুঝল বোকামি হয়ে গেছে। কথাটা কর্নেল সুবান্দ্রিও বলেছে পরিষ্কার বাংলায়। মুখে ওর মুচকি হাসি।

'এসব অত্যন্ত ছেলেমানুষি কৌশল, কর্নেল। আমি বাংলা জানি। আমার বাবা বাঙালী ছিলেন। বাংলা জানাটা আমার জন্যে অপরাধ নয়,' ভাঙা বাংলায় বলল রানা।

এবার হো হো করে উচ্চ স্বরে হেসে উঠল সুবান্দ্রিও।

'স্পাই জগতে আপনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, মিস্টার আবদুল্লাহ হারুন। অত্যন্ত মূল্যবান রত্ন। আপনাকে সবকিছু শিখিয়ে পাঠানো হয়েছে এখানে, কি উদ্দেশ্যে তা একমাত্র ভগবানই জানেন, কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে শেখাতে পারেনি তারা। সেটা হচ্ছে একজন সত্যিকারের কাশ্মীরী মুসলমানের মানসিকতা। নির্মম অত্যাচারে মুসলিম জনসাধারণের মেরুদণ্ড আজ প্রায় ভেঙে দিয়েছি আমরা।

সোজা হয়ে হাঁটতেও আজ তারা ভয় পায়, পাছে বিপ্লবী মনে করে ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। জোরে হাসতে পর্যন্ত দেয়া হয় না ওদের। আর তাদের কাউকে যদি এই গাড়িতে করে নির্যাতন করবার জন্যে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হত তাহলে আপনার মত নির্বিকার মুখে বসে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব হত। অনেক লোককে ধরে নিয়ে গেছি আমি এই গাড়িতে। তাদের ভয় আর কান্না দেখে আমারই কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করেছে। আপনি তাদের কেউ হতেই পারেন না। আপনি যদি…'

হঠাৎ কথা বন্ধ করে কার্টসি লাইটটা নিভিয়ে দিল সুবান্দ্রিও। জানালাটা তুলে দিল ওপরে। বেশ কিছু দূর থেকে একটা এঞ্জিনের গর্জন কানে এল রানার। হাতের সিগারেটটা নিচু করে রাখল কর্নেল। একটা গাড়ি চলে গেল বড় রাস্তা দিয়ে পশ্চিমে। আধ মিনিট চুপচাপ থেকে এঞ্জিন চালু করল কর্নেল। পিছিয়ে এসে উঠে পড়ল আবার বড় রাস্তায়। উইণ্ডস্ক্রীন ওয়াইপারটা চালিয়ে দিয়ে তুষার সরিয়ে ফেলল। তারপর ছুটল গাড়ি শ্রীনগরের পথে।

মাইল তিনেক থাকতেই আবার মেইন রোড থেকে সরে গেল কর্নেল। অনেকগুলো সরু আঁকাবাঁকা গলি ঘুরে এগিয়ে চলল গাড়ি। অনেকখানি উঁচু হয়ে তুষার জমেছে এই রাস্তায়। গাড়িটা রাস্তা থেকে সরে বারবার গর্তে পড়তে চাইছে। খুব সতর্ক হয়ে চালাতে হচ্ছে গাড়িটা, কিন্তু তারই মধ্যে প্রতি তিন-চার সেকেণ্ড অন্তর অন্তর একবার করে দৃষ্টি ফেলছে সে রানার ওপর। রানা হিসেব করে দেখল আর বড়জোর দশ মিনিট সময় আছে হাতে। শহরের মধ্যে চলে এসেছে ওরা।

নির্জন শ্রীনগরের রাস্তা। দু'পাশে বাড়িঘর, দোকান-পাট, হোটেল-রেস্তোরাঁ। চারদিকে মৃত্যুর মত শীতল স্তব্ধতা। বহুবার অসংখ্য ছবি আর ম্যাপ দেখে মুখস্থ করা রাস্তাঘাট-পার্ক-লেক জীবন্ত হয়ে উঠল ওর চোখের সামনে, সব চিনতে পারছে সে অক্লেশে। যেন সিনেমা দেখছে এমনি একটা অনুভূতি হলো রানার। অবাস্তব লাগছে সবকিছু।

এইবার হাবাহ্ ব্রিজ পেরিয়ে এগিয়ে চলল শেভ্রোলে। ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভেতরটা। মোড় ঘুরলেই গুলনার রোড। এসে গেছে এ-আরবিকে হেডকোয়ার্টার। রানা বুঝল, ভয় পেয়েছে সে। গতি কমে এল গাড়ির। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চাইল কর্নেল।

'কোথায় এসেছেন, চিনতে পারছেন আশা করি?' গাড়িটা থেমে দাঁড়াল।

'আপনাদের হেডকোয়ার্টার।'

'ঠিক বলেছেন। এখানটায় এসেই আপনার উচিত ছিল জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়া, বিকারগ্রস্তের মত প্রলাপ বকা, অথবা ভয়ে কেঁদে ওঠা। সবাই তাই করে। কিন্তু আপনি করছেন না।' রানার দিকে তীক্ষ্ণ নীল দৃষ্টিতে চাইল কর্নেল। তারপর বলল, 'আপনাকে আপাতত একটা ছোট সাউণ্ডপ্রুফ অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাচ্ছি। আপনার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হবে সেখানে।'

আরও কয়েক সেকেণ্ড এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে চেয়ে রইল কর্নেল। তারপর ওর চোখের ওপর একটা রুমাল বেঁধে দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। দশ মিনিট ধরে এঁকেবেঁকে ডাইনে বাঁয়ে চলল গাড়িটা। দিক ভুলে গেল রানা।

কয়েকটা বড়-বড় ঝাঁকি খেলো, একটা সরু গলি দিয়ে কিছুদূর গিয়েই থেমে দাঁড়াল গাড়ি জোরে ব্রেক কষে। এক্‌জস্টের শব্দ শুনে রানা বুঝল কোনও বদ্ধ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। এঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতেই খটাং করে পেছনের একটা লোহার গেট বন্ধ হয়ে যাবার শব্দ শোনা গেল।

রানার পাশের দরজাটা খুলে গেল। শিকলগুলো খুলে দিল কেউ। গাড়ি থেকে ওকে নামিয়ে চোখের বাঁধনটা খুলে দিল একজন।

উজ্জ্বল আলোয় কয়েকবার চোখ মিটমিট করল রানা। একটা বড়সড় গ্যারেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে। দেয়ালের গায়ের একটা ছোট দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকবার ব্যবস্থা। রানা এবং দরজাটার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। এই লোকটাই ওর শিকল খুলে দিয়েছিল। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখল রানা লোকটাকে। এই লোক থাকতে এ-আরবিকে-র আর নির্যাতনের অন্য কোনও যন্ত্র নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয় না। ওই প্রচণ্ড শক্তিশালী হাত দিয়ে ও যে-কোনও মানুষকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে। রানার সমানই হবে লম্বায়, কিন্তু কাঁধটা প্রকাণ্ড, মস্ত উঁচু বুক, বীভৎস মুখের চেহারা। ভয়ঙ্কর দর্শন এক গরিলা বিশেষ। কিন্তু রানা লক্ষ করল ওই বীভৎস মুখের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান এক জোড়া শান্ত সরল চোখ চেয়ে আছে ওর দিকে।

কর্নেল সুবান্দ্রিও গাড়ি থেকে নেমে সশব্দে দরজা বন্ধ করল। ঘুরে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। প্রকাণ্ড লোকটার পাশে ওকে সরু একটা ঝাঁটার কাঠির মত লাগল রানার। রানার দিকে ইশারা করল কর্নেল।

'আজকের আসরের বিশিষ্ট শিল্পী। চমৎকার কাওয়ালী গাইবে আজ রাতে। চীফ ঘুমিয়ে পড়েছে, খান?'

'না। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন অফিস কামরায়।' যেন প্রকাণ্ড একটা জালার মধ্যে থেকে কথাগুলো বেরোল। গমগম করে উঠল গ্যারেজটা।

'চমৎকার! কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি আমি। তুমি এই ভদ্রলোককে একটু দেখো। খুব সাবধান থাকবে—সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর এই লোক।'

'আমি লক্ষ রাখব,' বলল খান। উর্দুর মধ্যে পশতু টান। রানা বুঝল লোকটা আফ্রিদি।

রানার সুটকেসটা হাতে নিয়ে চলে গেল কর্নেল। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল খান। দুই ভিম-বাহু বুকের ওপর ভাঁজ করা। হঠাৎ সোজা হয়ে গেল খান—এক পা এগিয়ে এল রানার দিকে। বলল, 'শরীর খারাপ করছে আপনার?'

'না, না। ঠিক আছি আমি।' রানার গলাটা ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল, দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে সে, অল্প অল্প দুলছে ওর শরীরটা। শিকল বাঁধা হাত দুটো তুলে ঘাড়ের পেছনটা চেপে ধরল, গাল দুটো কুঁচকে গেল একটু। 'মাথার পেছনটা···আমার মাথার পেছনটা···।'

আরেক পা এগিয়ে এল খান, তারপর দ্রুতপায়ে ছুটে এল সামনে রানা চোখ উল্টে পড়ে যাচ্ছে দেখে। এভাবে পড়ে গেলে মাথাটা শানে পড়ে ফেটে যেতে পারে, মারাও যেতে পারে—তাই লাফিয়ে ছুটে এল খান দুই হাত বাড়িয়ে।

দেহের সর্বশক্তি দিয়ে মারল রানা খানকে। দুই হাত জড় করে কারাতের

কোপ। ঘাড়ে। কানের একটু নিচে। জীবনে এত প্রচণ্ড আঘাত সে আর কাউকে করেনি। মনে হলো যেন হাত দুটো পড়ল কোন কাঠের গুঁড়ির ওপর। ব্যথায় ককিয়ে উঠল রানা। কড়ে আঙুল দুটো ভেঙেই গেছে বুঝি।

মানুষ খুন করবার জন্যে কারাতের এই মারণাঘাত। যে-কোনও স্বাস্থ্যবান লোককে খুন করবার পক্ষে এই আঘাতই যথেষ্ট। মারা না গেলেও কয়েক ঘন্টার জন্যে যে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু খান কেবল চমকে উঠল একটু। মাথাটা একটু ঝাড়া দিয়ে নিল। গতি কমাল না একটুও। রানা যাতে পা চালাতে না পারে সেজন্যে একটু সরে গেল শুধু।

রানার দুই বাইসেপ ধরে দেহের সমস্ত ওজন দিয়ে চেপে ধরল খান গাড়ির সাথে। অসহায় রানা অবাক হয়ে চেয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। এই সাঙ্ঘাতিক মারকেও কোনও লোক যে অবজ্ঞা করতে পারে সে-ধারণা ছিল না ওর। তাজ্জব হয়ে সে কেবল চোখে চোখে চেয়ে থাকল, বাধা দেবার ক্ষমতাও রইল না আর। এবার সাঁড়াশীর মত হাত দুটো চাপতে থাকল রানার দুই বাহু। শান্ত সরল দুই চোখ মেলে চেয়ে আছে সে রানার চোখের দিকে, আর ক্রমেই মাংসের ভেতর বসে যাচ্ছে ওর আঙুলগুলো। রাগ বা হিংসার লেশমাত্র নেই খানের চোখে।

দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল রানার। চিকন ঘাম দেখা দিল কপালে। মনে হলো হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে খানের আঙুল—এবার হাড় দুটোও গুঁড়ো হয়ে যাবে। ঝাপসা হয়ে গেল চোখের সামনে সবকিছু, দুলতে থাকল পৃথিবীটা। ঠিক এমনি সময়ে ছেড়ে দিল ওকে খান। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ডলছে সে এখন নিজের ঘাড়টা।

'এর পরের বার আরেকটু ওপরে চাপ দেব,' শান্ত গলায় বলল খান। 'ঠিক যেখানে আমাকে মেরেছেন, ওইখানে। দেখুন তো, এই অনর্থক বোকামির কোন মানে হয়? শুধু শুধু দু'জনেই ব্যথা পেলাম।'

ধীরে ধীরে তীব্র ব্যথাটা কমে এল। খানের চোখ সতর্ক থাকল রানার পরবর্তী কৌশল প্রতিরোধ করবার জন্যে। ঠিক পাঁচ মিনিট পর খুলে গেল দরজা। আঠারো-উনিশ বছর বয়সের একটা ছোকরা এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। পাতলা ছিপছিপে। কাউ-বয় ড্রেস পরা। চুলটা শাম্মী কাপুরের মত। দাড়ি গোঁফ ওঠেনি এখনও, কিন্তু চালচলন বড় মানুষের মত। রানার আপাদমস্তকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে পেছন দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'ওকে অফিস কামরায় নিয়ে যেতে বলেছে চীফ।'

রানাকে নিয়ে এগোল খান। দুটো ঘর পেরিয়ে একটা বারান্দায় এল ওরা। কিছুদূর সোজা গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল। তারপর ঢুকে পড়ল ডানদিকের দরজা দিয়ে।

বেশ বড়সড় অফিস ঘরে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। মেঝের ওপর পড়ে আছে ওর জামা কাপড়ের পাশে কুচি কুচি করে কাটা সুটকেস। হ্যাণ্ডেলটা পর্যন্ত ভেঙে দেখা হয়েছে। একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল সুবান্দ্রিও। চেয়ারে বসা লোকটাকে ভালমত দেখা যাচ্ছে না মুখের ওপর একটা থামের ছায়া পড়েছে বলে। এক হাতে ধরে রয়েছে সে রানার জাল কাগজপত্র। টেবিলের ওপর সেগুলো নামিয়ে রেখে চেয়ারে বসা লোকটা কথা বলে উঠল।

'দুই সেট পরিচয়-পত্রের দুটোই জাল। কাজেই আপনাকে কোনও নামে সম্বোধন করতে পারছি না। আপনার আসল নামটা বলবেন দয়া করে?' ভদ্রভাবে প্রশ্ন করল সে। তারপর চোখ পড়ল খানের ওপর। 'তোমার কি হয়েছে খান, ঘাড় ডলছ কেন?'

'ও মেরেছে,' লজ্জিত হয়ে বলল খান। 'কিভাবে কোথায় মারতে হয় জানে লোকটা। আর খুব জোরে মারে।'

'ভয়ানক লোক!' বলল কর্নেল। 'আমি তোমাকে আগেই সাবধান করেছিলাম, খান।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ভদ্রলোক ভারি ধূর্তও। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার ভান করেছিল।'

'তোমাকে মারা মানেই বোঝা যাচ্ছে কি পরিমাণ মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা। সাহস আছে বলতে হবে। যাক, কি নাম বললেন না?' চেয়ারে বসা লোকটা বলল।

'আমি কর্নেল সুবান্দ্রিওকে তো বলেছি, আমার নাম হারুন। আবদুল্লাহ হারুন। আমি এক কুড়ি নাম বানিয়ে বলতে পারি। কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না। আমার এই পরিচয় আমি প্রমাণ করতে পারি। এই আমার নাম। আবদুল্লাহ হারুন।'

'আপনি সাহসী লোক। কিন্তু এখানে আপনার সাহসকে বাহবা দেবার লোক পাবেন না, ধূলির সাথে মিশে যাবে আপনার সাহস ও শক্তি। কেবল সত্য টিকবে, আর কিছু নয়। বলুন আপনার নাম।' অসহিষ্ণু ভাবে হাত নাড়ল লোকটা। রানা দেখল, নীল কালিতে কয়েকটা অক্ষর টাট্টু করা আছে লোকটার বাহুতে। পড়া গেল না।

ধীরে ধীরে কেন জানি ভয়টা কেটে যাচ্ছে রানার। এ-আরবিকে সম্পর্কে সে যা জানে কোথায় যেন তার সঙ্গে মিল পড়ছে না। এদের ব্যবহারে যে সূক্ষ্ম সৌজন্য প্রকাশ পাচ্ছে সেটা কি পরবর্তী আসন্ন আঘাতের জন্যে ওকে অপ্রস্তুত করে ফেলবার জন্যে?

'আমরা অপেক্ষা করছি,' ধীর স্থির শান্ত সংযত কণ্ঠস্বর। রানা চুপ।

'বেশ। গায়ের সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে ফেলুন।'

'কেন?' বিস্মিত রানা দেখল সুবান্দ্রিওর হাতে একটা পিস্তল।

'লক্ষ্মী ছেলের মত আদেশ পালন করুন। নইলে আপনার জামা-কাপড় ছিঁড়ে নামাবে খান। আমার পিস্তলটাও প্রস্তুত রইল,' বলল কর্নেল।

হ্যাণ্ডকাফ খুলে দেয়া হলো। এক মিনিটে সমস্ত জামা কাপড় খুলে মেঝেতে ফেলল রানা। দাঁড়িয়ে রইল ঘরের উজ্জ্বল বাতির নিচে সম্পূর্ণ দিগম্বর অবস্থায়। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে সে।

'কাপড়গুলো সব এখানে নিয়ে এসো, খান। আর পেছনের ওই বেঞ্চের ওপর কম্বল আছে একটা—ব্যবহার করতে পারেন আপনি ইচ্ছে করলে।'

রানা বুঝল ওকে উলঙ্গ করা হলো জামাকাপড়গুলো পরীক্ষা করবার জন্যে—পিটাবার জন্যে নয়। অবাক হলো সে। আরও অবাক হলো, এই শীতের রাতে শত্রুশিবিরে ওর জন্যে কম্বলের ব্যবস্থা দেখে। সৌজন্য, ভদ্রতা, দয়া-মায়া—

এ-আরবিকে হেডকোয়ার্টারে এসব কেন? কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল সে।

ঠিক এমনি সময়ে একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলা এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। চেনা-চেনা লাগল রানার, কিন্তু ঠিক মনে পড়ল না কোথায় দেখেছে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হবে। ঘুম থেকে সদ্য উঠে এসেছে সে। একহাতে চোখ ঘষছে, মুখে বিরক্তির ভাব। খোলা এলোচুল বিছিয়ে পড়েছে পিঠের ওপর।

'এত রাত পর্যন্ত কিসের বকর-বকর চলেছে তোমাদের? দেড়টা বেজে গেছে সে-খেয়াল আছে? একটু ঘুমোতে দেবে, না—' হঠাৎ রানার কাপড়গুলোর দিকে চোখ পড়ল ওর। ঝট করে ঘুরে চাইল সে রানার দিকে অবাক দুই আয়ত চোখ মেলে।

'কে⋯কে ওই লোকটা, জিঞ্জির?'

তিন

'জিঞ্জির!' স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা নিজের অজান্তেই। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখটা আশায়, উৎসাহে। কম্বলটা খসে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল বাম হাতে। এগিয়ে গেল দুই-পা। 'কি বললেন? জিঞ্জির?'

ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা কয়েক পা। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। তাই বলেছি আমি। জিঞ্জির।'

'জিঞ্জির!' বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না রানার। এগিয়ে গেল সে টেবিলের দিকে। এইবার পরিষ্কার দেখতে পেল সে লোকটার মুখ। প্রৌঢ় একজন লোক বসে আছে চেয়ারে। সারা মুখে বড় বড় গভীর ক্ষতচিহ্নের দাগ। জায়গায় জায়গায় সাদা হয়ে আছে চামড়া। আগুনে পুড়ে গিয়েছিল লোকটি বোধহয়। একবার চাইলে আর দ্বিতীয়বার চাইতে ইচ্ছে করে না ওই মুখের দিকে। 'আপনার নাম জিঞ্জির?'

'হ্যাঁ, আমার নাম জিঞ্জির।'

'দুই নয় ছয় নয় সাত। তাই না?' রানা চাইল ওর চোখের দিকে। কোন ভাব পরিবর্তন নেই।

'দুই নয় ছয় নয় সাত কি?'

'আপনি যদি জিঞ্জির হয়ে থাকেন তাহলে নম্বরটা হচ্ছে দুই নয় ছয় নয় সাত,' বলল রানা লোকটার চোখে চোখ রেখে। বাম হাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। কেউ বাধা দিল না। কোটের হাতাটা তুলে দিল খানিকটা ওপরে। সমস্ত হাতটাই পোড়া। লাল-কালো পোড়া দাগ কুৎসিত দেখাচ্ছে। কিন্তু সেই হাতের ওপর নীল হয়ে আছে পরিষ্কার ইংরেজি লেখা ২৯৬৯৭।

'আমার সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন মনে হচ্ছে?' সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জিঞ্জির।

'অনেক কিছু।' ঘরের সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এঁরা কি আপনার মিত্র? এঁরা সবাই জানেন আপনি কে—মানে আপনার সত্যিকার পরিচয়? এঁদের সামনে কথা বলা যাবে?'

'নিশ্চিন্তে বলতে পারেন যা খুশি।'

'জিঞ্জির হচ্ছে মুক্তি সংগ্রামীদের সবচাইতে শক্তিশালী দলটির নাম। এই জিঞ্জির সেইদিনই ভাঙবে, যেদিন কাশ্মীরে আসবে আজাদী। দলপতি মেজর জেনারেল দিলদার বেগের ছদ্মনামও জিঞ্জির ১৯১০ সালের ১৯ জুলাই আপনার জন্ম মুজাফ্‌ফরাবাদের শাহকোটে। এ খবর জেনেছি আমি মেজর জেনারেল রাহাত খানের কাছ থেকে। ফুঁ দিলে ইলেকট্রিক বাল্‌ব নেভে কিনা জিজ্ঞেস করতে বলেছেন উনি আপনাকে। এর কি মানে আমি জানি না।'

'ওটা পুরানো দিনের একটা রসিকতা,' হাসল জিঞ্জির। হেলান দিয়ে বসল চেয়ারটায়। 'বুড়ো মরেনি তাহলে এখনও। ও সহজে মরবে না, আমি জানতাম, ওর মরণ নেই। ইবলিসের মত ধূর্ত, শয়তান লোক। তেমনি দুর্দান্ত সাহস। বার্মা ফ্রন্টে দুই-দুইবার জীবন বাঁচিয়েছিল আমার। আপনি নিশ্চয়ই ওর ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন, মি···?'

'রানা। মাসুদ রানা। আমি ওঁর অধীনেই চাকরি করি।'

'ওর চেহারা, স্বাস্থ্য, কাপড়-চোপড়, সবকিছু বর্ণনা করুন।'

নিখুঁতভাবে বর্ণনা করল রানা। মন দিয়ে শুনল জিঞ্জির। তিন মিনিট পর হাত তুলে থামতে বলল।

'হয়েছে, হয়েছে। কাঁচা-পাকা ভুরু ছাড়া বাকি সবই ঠিক আছে। আপনি চেনেন ওকে এবং আপনি ওরই লোক তাতে আর আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বন্ধু এবার মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। এমন তো ওর ধারা ছিল না!'

'অর্থাৎ, আমি ধরা পড়ে গেলে আমাকে সব কথা বলতে বাধ্য করা হত, ফলে আপনিও ফেঁসে যেতেন?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'মেজর জেনারেল রাহাত খান এ ব্যাপারে কোনও রিস্ক নেননি। আপনার নাম এবং নম্বরটা ছাড়া আর কিছুই জানা ছিল না আমার। আপনি কোথায় থাকেন বা দেখতে কেমন, ধারণাই ছিল না।'

'তাহলে আমাদের খুঁজে পেতেন কোথায়?' চট করে জিজ্ঞেস করল সুবান্দ্রিও।

'কাফে ডি পার্লে রোজ সন্ধ্যায় একই আসনে গিয়ে বসবার আদেশ ছিল আমার ওপর ম্যাজেন্টা রঙের টাই পরে। হয় আপনারা, নয় গোল্ডেন ঈগল আমাকে খুঁজে নেবেন ওখান থেকে, উনি বলেছিলেন।'

'অথচ কত শর্টকাটে সব চুকে গেল। তাই না?' টিটকারি মেরে বলল কর্নেল সুবান্দ্রিও।

'ভালই হলো,' বলল জিঞ্জির। 'ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেছেন আমাকে। ঈগলকে আর পাওয়া যাবে না কোনদিন।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'মারা গেছে। এ-আরবিকে হেডকোয়ার্টারের টরচার চেম্বারে। ওদের সামান্য অসতর্কতার সুযোগে একটা পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে।'

'কিন্তু এসব খবর আপনারা জানেন কি করে?'

'কর্নেল সুবান্দ্রিও—অর্থাৎ আপনি যাকে কর্নেল সুবান্দ্রিও বলে জানেন—ছিল সেখানে। ওর পিস্তলটাই ছিনিয়ে নিয়ে আত্মহত্যা করেছিল গোল্ডেন ঈগল।'

অবাক হয়ে কর্নেলের দিকে চাইল রানা। এই লোক সেখানে থাকে কি করে?

'গত তিন বছর ধরে সুবান্দ্রিও কাজ করছে এ-আরবিকে-তে। ও হচ্ছে এ-আরবিকে-র একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট। যখন কোনও বন্দী আশ্চর্যজনক ভাবে শেষ মুহূর্তে পালিয়ে যায়, কিংবা কিছু গোলমাল হয়ে যায়, সব চাইতে খাপ্পা হয়ে ওঠে ও-ই—নির্মমভাবে পরিশ্রম করায় ওর লোকদের, জঘন্যতম গালাগালি বেরোয় ওরই মুখ থেকে। ওর চীফ মোহন সিং ওকে বোধহয় প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। কর্মতৎপতা আর হিংস্রতা দিয়ে হৃদয় জয় করেছে সে চীফের। অথচ শ' তিনেক কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ রক্ষার জন্যে চিরঋণী হয়ে আছে ওরই কাছে।'

কর্নেলকে দেখল রানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। অদ্ভুত মানুষ! কী ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে টিকে আছে সে। ওর ওপর লক্ষ রাখা হয়েছে কিনা, ওকে সন্দেহ করা হচ্ছে কিনা, কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করল কিনা, কিছু জানবার উপায় নেই। যে-কোনও মুহূর্তে হাতকড়া পড়তে পারে। আশ্চর্য! এমন অবস্থার মধ্যে বেঁচে আছে কি করে লোকটা? অথচ আজ এই লোকটা না থাকলে ওকে এ-আরবিকে হেডকোয়ার্টারের টরচার চেম্বারে আর্তনাদ করতে হত এই মুহূর্তে।

'অদ্ভুত ওঁর জীবন। প্রতিটা পদক্ষেপে ওঁর বিপদ। আশ্চর্য! কতখানি সাহস থাকলে মানুষ এমন ঝুঁকি নিতে পারে! কিন্তু মেজর জেনারেল…'

'আমাকে জিঞ্জির বলেই ডাকবেন। মেজর জেনারেল দিলদার বেগ মারা গেছে!' বাধা দিল জিঞ্জির। 'যাক, কি বলছিলেন আপনি?'

'বলছিলাম আজকের ব্যাপারটা।'

'ও, আপনাকে বন্দী করে আনার ব্যাপারটা…।'

'হ্যাঁ।'

'এটা খুব সহজ ব্যাপার। ও মাঝেমাঝেই এমন যায়। আজ এ-রাস্তায়, কাল ও-রাস্তায়। মাঝেমাঝেই এমন এক-আধজনকে ধরে নিয়ে আসে এখানে। আর আজকের ব্যাপার—আমরা জানতাম আপনি আসছেন।'

'কিন্তু…আজই শেষ,' বলল কর্নেল। 'প্রতিবারই আমি পুলিসের খুদে অফিসারগুলোকে ধমক-ধামক দিয়ে বলে আসি যেন এ ব্যাপারে একদম চেপে যায়। কিন্তু আজকে ওরা আগেই টেলিফোন করে দিয়েছিল। ফলে সমস্ত পোস্টে জানিয়ে দেয়া হবে এ-আরবিকে অফিসারের ছদ্মবেশে একজন লোক আসতে পারে, যেন তাকে সুদ্ধ বাঁধা হয়। কাজেই আজই শেষ।'

'কিন্তু…কিন্তু ওরা তো পরিষ্কার দেখেছে আপনাকে! চার-পাঁচ জন। আপনার চেহারার বর্ণনা এতক্ষণে…'

'ওসব কেয়ার করি না। আসলে যা ভয় পেয়েছিলাম, সেটা ভেঙেই বলি।

আজ অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত বের করবার চেষ্টা করেছি আপনি সত্যি সত্যিই পাকিস্তানী স্পাই কিনা, আমরা যাকে আশা করছিলাম সেই লোক, নাকি অন্য কেউ—কোনও রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিতে হবে। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল। এমনও তো হতে পারে, আপনি একজন এ-আরবিকে মেম্বার এবং আমাকে ট্র্যাপ করবার জন্যেই পাঠানো হয়েছে আপনাকে। কারণ আপনার মধ্যে ভয় দেখতে পাচ্ছিলাম না একবিন্দুও। এ-আরবিকে মেম্বারের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু হেডকোয়ার্টারের সামনে গাড়ি থামিয়ে যখন বললাম আপনাকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছি, আপনি নির্বিকার। তখন বুঝলাম আপনি এ-আরবিকে-র নিযুক্ত লোক নন—হলে আমি চিনতে পেরেছি এবং হত্যা করতে নিয়ে চলেছি বুঝতে পেরে হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলতেন। এই কুৎসিত সন্দেহ থেকে মুক্ত হতে পেরে আনন্দ হচ্ছে আমার। আচ্ছা, আমি একটু ঘুরে আসছি, জিঞ্জির।'

'যাও। একটু তাড়াতাড়ি এসো। মিস্টার মাসুদ রানা কি সংবাদ নিয়ে এলেন শুনতে হবে।'

'কথাগুলো একা আপনাকে বলবার আদেশ আছে,' বলল রানা।

'কর্নেল সুবান্দ্রিও আমার ডান হাত, মি. রানা।'

'ঠিক আছে। কিন্তু কেবল আপনারা দু'জন থাকবেন। কথাটা অত্যন্ত গোপনীয়।'

সুবান্দ্রিও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মেয়েটার দিকে ফিরল জিঞ্জির।

'কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে, রুবিনা? মাসুদ রানার খুব সম্ভব সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, তাই না?'

মেয়েটির নাম শুনে চট করে চিনতে পারল রানা। বোম্বাই ছায়াছবি ও মডেল জগতে একজন উদীয়মান তারকা। এই মেয়ে এখানে কেন? এদের সঙ্গে একজন অভিনেত্রীর কি সম্পর্ক? ওর মুখের ওপর থেকে বিস্মিত দৃষ্টি সরিয়ে এনে বলল, 'একটা সিগারেট ছাড়া আর কিছুই খেতে পাইনি সারাদিন।'

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে না?' বলল জিঞ্জির।

'দেখি কদ্দূর কি করা যায়। তুমি কিছু খাবে, জিঞ্জির?' মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে বলল রুবিনা। ঘুমের রেশ কেটে গেছে ওর।

'না। একগ্লাস পানি দিতে পারো। উমর, ছাদটা একপাক ঘুরে এসো। খান, গাড়ির নাম্বার প্লেট পুড়িয়ে ফেলে নতুন নাম্বার লাগিয়ে ফেলো। সবাই কুইক।'

টেডি ছোঁড়াটা বেরিয়ে গেল মেয়েটা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সেটা দিয়ে। রুবিনা আর খান চলে গেল একসাথে অন্য দরজা দিয়ে। একটু পরেই একগ্লাস পানি নিয়ে ঢুকল রুবিনা। চুলটা আঁচড়ে নিয়েছে সে। অদম্য কৌতূহল নিয়ে রানার দিকে চাইল সে একবার। মৃদু হেসে বলল, 'পনেরোটা মিনিট অপেক্ষা করতে পারবেন না, মি. মাসুদ রানা?'

'করতেই যদি হয়, পারব,' হাসল রানা। 'কিন্তু কঠিন হবে।'

'যত তাড়াতাড়ি পারি করছি,' দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল সে।

'ইনি আপনার কে হন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার শিষ্যা। কাশ্মীরেরই মেয়ে। আমাদের দলের প্রায় সমস্ত খরচ ও-ই

বহন করে। অভিনয় ও মডেলিং করে উপার্জন করে নিয়ে আসে বোম্বাইয়া টাকা। আমার নিজের তো কোনও আয়-রোজগার নেই।'

'কর্নেল সুবান্দ্রিও-ও তো উপার্জন করে?'

'তা করে—কিন্তু একজন কর্নেলের সমান নয়। আসলে ওর র‍্যাঙ্ক হচ্ছে মেজর। পদমর্যাদাটা ওর খেয়াল-খুশি মত বিনা দ্বিধায় ক্যাপ্টেন থেকে মেজর জেনারেল পর্যন্ত ওঠানামা করে।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না। আমার কথাগুলো অত্যন্ত গোপনীয়। কেউ আড়ি পেতে শুনবে না তো?'

'না-না। ওসব ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। মোট ছ'টি প্রাণী আছে এখন এ বাড়িতে। আপনি আমি ছাড়া আর আছে রুবিনা, কর্নেল, খান আর উমর। এদের কাউকে আমি সন্দেহ করি না। এরা খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি।'

জামা-কাপড় পরে নিল রানা। লাইট নিভিয়ে দিয়ে জানালার পাশে সরে গেল জিঞ্জির। কালো পর্দা সরিয়ে রাস্তাটা দেখে নিল এক নজর। তারপর ফিরে এসে আবার জ্বেলে দিল লাইট। কাগজপত্র একটা ব্যাগে তুলে রাখল রানা ভাঁজ করে। তারপর পিস্তলটা ভরে নিল শোল্ডার হোলস্টারে।

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল রুবিনা। বলল, 'তাড়াহুড়ো করে যা পারলাম নিয়ে এলাম। মাংসটা বোধহয় আপনার পক্ষে ঝাল হয়ে যাবে একটু বেশি।'

'চমৎকার গন্ধ ছুটছে। দুই মিনিটে সাফ হয়ে যাবে সব। কিন্তু আপনাকে এত রাতে কষ্ট দিয়ে আমার রীতিমত খারাপ লাগছে,' বলল রানা।

'আমার অভ্যেস আছে। জিঞ্জিরের বন্ধু-বান্ধবের এমন শেকলভাঙা স্বভাব, কিছুতেই নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আসতে চায় না। ভোর রাতে যদি নতুন কেউ আসে অবাক হব না।'

'হয়েছে, হয়েছে। সুযোগ পেলেই খালি জিঞ্জিরের বদনাম। যাও, এখন শুয়ে পড়ো গিয়ে,' স্নেহ ঝরে পড়ল জিঞ্জিরের কণ্ঠে।

'খানিকক্ষণ থাকি না?' আবদার করে বলল রুবিনা।

'তা তো থাকতে চাইবেই,' এবার কৌতুকের ঝিলিক খেলে গেল জিঞ্জিরের চোখে। 'ছেলেটা রীতিমত হ্যাণ্ডসাম, তাই না? তোমার সেই স্বপ্নের রাজপুত্তুরের মতই লাগছে অনেকটা।'

'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি,' কপট রাগ দেখিয়ে চোখ পাকাল রুবিনা। কিন্তু গাল দুটো লজ্জায় লাল হয়ে গেছে।

'ভাল তো হবেই না। জানেন, মি. রানা, ও আমাকে বলেছে, একদিন পাকিস্তান থেকে আসবে সুপুরুষ একজন যুবক। এক মুহূর্তে কেড়ে নেবে ওর মন। ওকে নিয়ে…' ছুটে এসে মুখ চেপে ধরল রুবিনা।

'তুমি একেবারে চশমখোর, বেহায়া।'

'তুমি এখানে থাকলে আরও বলব। দুই রাত ঘুম হয়নি তোমার। তাছাড়া আমাদের গোপন আলোচনা আছে। যাও শুয়ে পড়ো, লক্ষ্মী।'

'যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি,' চলে গেল রুবিনা।

রুবিনা বেরিয়ে যেতেই ঘরে ঢুকল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক যুবক। ঝট করে ঘুরে

পিস্তল বের করে ফেলল রানা। ক্লিক করে সেফটি ক্যাচ নামানোর শব্দ হলো। এক পা ঢুকেই থমকে দাঁড়াল যুবক। রানার বয়সী হবে, ব্যাক ব্রাশ করা কোঁকড়া চুল, অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। ফর্সা সম্ভ্রান্ত চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত নীল দুই চোখ। মৃদু হাসি ফুটে উঠল লোকটার মুখে। ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াল সে। হঠাৎ রানা অবাক হয়ে চাইল জিঞ্জিরের মুখের দিকে। হাসছে সে। পিস্তলের মুখটা সরিয়ে দিল জিঞ্জির একহাতে।

'সুবান্দ্রিও ঠিকই বলেছিল আপনার সম্পর্কে,' আস্তে আস্তে বলল সে। 'ভয়ঙ্কর, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লোক আপনি। বিজলির মত দ্রুত। কিন্তু এই ভদ্রলোক আমাদের মিত্র। রীতিমত বন্ধুই বলতে পারেন। ওর নাম ফজল মাহমুদ।'

পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল রানা। একটা চেয়ারে এসে বসল লোকটা। পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করতেই চিনতে পারল রানা—কর্নেল সুবান্দ্রিও। ওর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে হাসল সে। 'হ্যাঁ, আমিই সুবান্দ্রিও ছিলাম, কিন্তু এখন আমি ফজল মাহমুদ। যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে এতটুকু বলতে পারি, ছদ্মবেশ ধারণে আর কণ্ঠস্বর নকলে আমার জুড়ি কেউ আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে জন্মায়নি। এখন মোটামুটি যে চেহারাটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছি আমি। এরপর এখানে একটু দাগ, ওখানে একটু কাটা চিহ্ন দিলেই হয়ে যাব এ-আরবিকে-র মেজর রামপাল যোশী। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন পুলিস ব্লকের সবাই আমার চেহারা দেখলেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইনি কেন?'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি জিঞ্জিরের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করেন? বিপদজনক নয়?'

'আমি তো এখানে থাকি না। আমি থাকি শ্রীনগরের সবচাইতে নামকরা হোটেল দুটোর একটায়। অবিবাহিত পুরুষ মানুষ—কাজেই মাঝে মাঝে হোটেলে না ফিরলে কেউ আর সেটাকে বড় করে ধরে না। সবাই বোঝে আমোদ ফুর্তি করতে বেরিয়েছি। কিন্তু এখন কাজের কথায় আসা যাক।'

'আসছি,' খাওয়া শেষ করে এক গ্লাস পানি খেলো রানা ঢকঢক করে। তারপর চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিল ওদের দু'জনের দিকে। 'আপনারা দু'জনেই বোধহয় ডক্টর সেলিম খানের নাম শুনেছেন?'

'নিশ্চয়ই। সবাই শুনেছে। বৈজ্ঞানিক তো?'

'হ্যাঁ। পৃথিবী-বিখ্যাত নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। শান্তশিষ্ট অমায়িক বৃদ্ধ ভদ্রলোক—কিন্তু মাথাটা তাঁর শান দেয়া ছুরির মত।'

'সেজন্যেই ভারত সরকারের এত মূল্যবান সম্পদ তিনি।'

'কিন্তু এই সম্পদ চুরি করা সম্পদ,' বলল রানা।

'মানে?'

'বলছি। ক্যালকাটা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে যখন ছিলেন তিনি, সেই সময় লাগল রায়ট। ভারত সরকার প্রোটেকশন দিল ওঁকে। কিন্তু বিজ্ঞান সাধনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি দেখলেন তাঁর স্বজাতির ওপর কি নির্মম অত্যাচার করল ওরা। ঘর জ্বালিয়ে দিল, রাস্তায় টেনে এনে নির্মমভাবে হত্যা করল নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে মিলিটারি এবং পুলিস গার্ডের চোখের সামনে, অন্দরমহল থেকে স্ত্রী-কন্যাকে টেনে বের করে

চরম অপমান করল, আর সবশেষে ভিটেছাড়া করে পাঠিয়ে দিল পাকিস্তানে। এই নিষ্ঠুর নির্যাতন নিজের চোখে দেখে তিনি মনস্থির করলেন পাকিস্তানে চলে যাবেন। ঠিক এমনি সময় তাঁর ছেলেটাকে স্ট্যাব্ করা হলো ধরমতলার মোড়ে। ছেলেটা বাঁচল না। ছোট দুই ছেলেকে নিয়ে বাস্তুত্যাগীদের সাথে মিশে গোপনে পালিয়ে এলেন তিনি পাকিস্তানে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন তখন দার্জিলিং-এর যক্ষ্মা স্যানাটোরিয়ামে। তাঁকে আটকে রাখল ভারত সরকার। মুমূর্ষু স্ত্রীর শেষ অবস্থার কথা জানিয়ে খবর দিল ওরা ডক্টর সেলিমকে ওদের এজেন্ট মারফত। পাগলের মত ছুটে এলেন তিনি দার্জিলিং-এ এবং সেই যে আটকা পড়লেন আর বেরোতে পারলেন না। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের ডিরেক্টর বানিয়ে ওরা ছলে বলে কৌশলে ওঁর কাছ থেকে কাজ আদায়ের চেষ্টা করল। তাতেও যখন তিনি বেঁকে বসলেন, তখন আরম্ভ হলো উৎপীড়ন। এতেও ওঁকে নোয়ানো যেত না, কিন্তু আমরা গোপনে ওঁকে স্ত্রীসহ উদ্ধার করবার আশ্বাস দিলাম এবং আপাতত ওদের হয়ে কাজ চালাতে বললাম। সে আজ তিন বছরের কথা। কোনও রকম সুযোগ পাইনি আমরা এর মধ্যে। সব সময় সতর্ক প্রহরার মধ্যে রেখে কাজ আদায় করা হচ্ছে। এখন আবার নিউক্লিয়ার বম্ব তৈরি হতে চলেছে ভারতে। দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে সতর্কতামূলক তৎপরতা। ডক্টর সেলিম খান হাতছাড়া হয়ে গেলেই পিছিয়ে পড়বে ওরা কয়েক বৎসর।'

'বুঝলাম,' জিঞ্জির কথা বলল এতক্ষণে। 'শ্রীনগরের ইন্টারন্যাশনাল সাইন্টিফিক কনফারেন্সে আসছেন নিশ্চয়ই সেলিম খান?'

'হ্যাঁ। উদ্বোধনী বক্তৃতা উনিই দিচ্ছেন।'

'আপনি এসেছেন ওঁকে এখান থেকে নিয়ে কেটে পড়তে?'

'হ্যাঁ। সেজন্যে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

'সহজ হবে না। ওঁর স্ত্রী কোথায়? সঙ্গে?'

'না। ওঁর স্ত্রীকে নয়া দিল্লী থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে আমাদের দু'জন লোক সপ্তাহখানেক আগেই পৌঁছে গেছে সেখানে। সেটা বিশেষ অসুবিধে হবে না। ওরা সেলিম খানকে চায়, তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীকে নয়। ওদিকে প্রহরার ব্যবস্থা ঢিলে থাকবে। তাছাড়া আমাদের দু'জন লোকই এ ব্যাপারে এক্সপার্ট। কোনও অসুবিধে হবে না। ওরা নিরাপদে বর্ডার পেরোলেই সিগন্যাল পাব আমি।'

'তা, কিভাবে সেলিম খানকে নিয়ে যাবেন?'

'সেটা কিছুই ঠিক হয়নি। যেভাবে পারি, আমার নিতে হবে। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট জানি আপনাদের সাহায্য ছাড়া কাজটা অসম্ভব। মেজর জেনারেল রাহাত খান এ ব্যাপারে মেজর জেনারেল দিলদার বেগের সাহায্যপ্রার্থী। আমি এসেছি দূত হিসেবে।'

কয়েক মিনিট চুপচাপ কিছু চিন্তা করল জিঞ্জির। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'পাকিস্তানের কাছে শত-সহস্র ব্যাপারে আমরা ঋণী আছি। তাছাড়া রাহাত খান আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। আর একজন বৃদ্ধ লোককে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে শত্রু পরিবেশের মধ্যে আটকে রাখা জঘন্যতম অন্যায়। সফল হতে পারব কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করব—এটুকু ভরসা আপনাকে দিতে

পারি।'

চার

ফজল মাহমুদের হাতের একটা গাঁট্টা খেয়ে উঠে বসল হোটেলের পোর্টার। দুই তাড়া লাগাল মাহমুদ। 'নাইটপোর্টার, দিনে ঘুমাবে। যাও ম্যানেজারকে ডেকে আনো।'

'এত রাতে ম্যানেজার?' দেয়াল ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে নিয়ে দুই হাতে চোখ কচলে বলল, 'ম্যানেজার ঘুমিয়ে আছে, কাল সকালে আসবেন।'

কলার ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে আইডেন্টিটি কার্ডটা ওর চোখের সামনে ধরল মাহমুদ। ভয়ে পাংশু হয়ে গেল মুখ। চোখ দুটো ছানাবড়া।

'আমাকে মাফ করে দেন, হুজুর। আমি···আমি জানতাম না।'

'জানতে না মানে? আমরা ছাড়া আর কে এসে এত রাতে ডেকে তুলবে?'

'কেউ না, হুজুর···কেউ না। তবে ভেবেছিলাম বিশ মিনিট আগেই তো ঘুরে গেছেন আপনারা তাই···'

'আমি এসেছিলাম?'

'না, না হুজুর। আপনি না, আপনাদের লোক···'

'আমি জানি। আমিই পাঠিয়েছিলাম ওদের। যাও, তোমাকে যা বলেছি তাই করোগে যাও।'

'এক্ষুণি যাচ্ছি, হুজুর!' ছুটে চলে গেল পোর্টার ম্যানেজারকে ডাকতে।

রানা বলল, 'চমৎকার অভিনয়! আমি পর্যন্ত ভড়কে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে।'

'প্র্যাকটিস, বলল মাহমুদ। 'ওদের তেমন কোনও ক্ষতি হয় না, এ-দিকে আমার সুনাম হয় প্রচুর। কিন্তু কি বলল শুনলেন?'

'হ্যাঁ। সময় নষ্ট করেনি ওরা একবিন্দুও।'

'সকাল পর্যন্ত প্রায় সব হোটেলেই খুঁজে বেড়াবে ওরা আপনাকে। জিঞ্জিরের বাসায় থাকার চেয়ে এখানে এখন অনেক নিরাপদ। খুব সম্ভব জিঞ্জিরের বাড়ির ওপর ওদের নজর পড়েছে। হয়তো অল্পদিনেই ওদের অন্য কোনও আস্তানায় সরে যেতে হতে পারে।'

পায়ের শব্দ শুনে থেমে গেল মাহমুদ। প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে হোটেলের ম্যানেজার। চোখে-মুখে ভয় আর উদ্বেগের চিহ্ন।

'মাফ চাই,' প্রথমেই হাত-জোড় করল ম্যানেজার। 'শত কোটিবার মাফ চাই। এই উল্লুকে পাট্ঠা···'

'আপনি ম্যানেজার?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল মাহমুদ।

'জী, আজ্ঞে স্যার।'

'তাহলে ওই উল্লুকে পাট্ঠাকে বিদায় করুন এখান থেকে। আমি গোপনে

আপনার সাথে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

বেরিয়ে গেল পোর্টার ঘর ছেড়ে। যথেষ্ট সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল মাহমুদ। আতঙ্কের উত্তেজনা চাপতে না পেরে কথা বলে উঠল ম্যানেজার।

'কি ব্যাপার, স্যার? আমার দ্বারা যদি কোনও সাহায্য হয় তবে...'

'বাজে কথা শুনতে চাই না। যা প্রশ্ন করব কেবল তার উত্তর দেবেন। আমার লোকেরা এসেছিল?' ঠাণ্ডা গলায় বলল মাহমুদ।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো কয়েক মিনিট আগে। আমি ঘরে ফিরে গিয়ে চোখটা কেবল বুজেছি...'

'আবার! বলেছি না, কেবল প্রশ্নের উত্তর দেবেন? ওরা নতুন লোক কেউ উঠেছে কিনা জিজ্ঞেস করেছে, রেজিস্টার চেক করেছে, তারপর একজন লোকের চেহারার বর্ণনা দিয়ে গেছে। তাই না?'

'জ্বী, আজ্ঞে স্যার।'

'ওই চেহারার কোন লোক এলে তৎক্ষণাৎ ফোন করতে বলে দিয়ে গেছে?'

'আজ্ঞে।'

'সেসব কথা ভুলে যান,' হুকুম দিল মাহমুদ। 'এই মাত্র জানা গেছে, সেই লোকটা হয় আগেই এসে গেছে এখানে, নয় আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এসে পৌঁছবে। ওর দলের লোক রীতিমত বাস করছে এই হোটেলে আজ কয়দিন যাবৎ। গত তিনমাসের মধ্যে এই নিয়ে চতুর্থবার আপনি জায়গা দিয়েছেন এই হোটেলে রাষ্ট্রের কয়েকজন ভয়ঙ্কর শত্রুকে।'

'এই হোটেলে?' চমকে উঠল ম্যানেজার। 'আমি আল্লার কসম খেয়ে বলছি, স্যার, আমার জ্ঞাতসারে...' কাঁপতে আরম্ভ করেছে ম্যানেজার প্রবল ভাবে। গলাটা ভেঙে গেল এখানে এসে।

'কাজেই সাবধান। আর একবার এই ব্যাপার ঘটলে আমরা বাধ্য হব আপনার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। সরাসরি আপনাকে ধরব আমরা পাকিস্তানী স্পাই আর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগের দায়ে।'

হাঁ করে কিছু বলতে চেষ্টা করল ম্যানেজার। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না, ঠোঁট নড়ল কেবল। রানা আশ্চর্য হয়ে ভাবল, কতখানি অত্যাচার করলে পরে এমন করে একটা দেশের জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া সম্ভব! কতখানি পাশবিক নির্যাতন চলেছে কাশ্মীরের ওপর!

'আপনাকে এই শেষ একটা চান্স দেয়া হচ্ছে,' রানার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমার লোক। যে স্পাইকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি—চেহারায়, শারীরিক গঠনে, অনেকটা তারই মত। তার ওপর আমরা আবার খানিক মেকআপ করে পাল্টে দিয়েছি এর চেহারা ওর মত করে। যাক্, সেসব আপনার জানার কোনও দরকার নেই। একটা কামরায় এর জন্যে ফার্স্ট-ক্লাস ব্যবস্থা করে দিন এক্ষুণি। অ্যাটাচড্ বাথ, শর্টওয়েভ রেডিও, টেলিফোন, অ্যালার্ম ঘড়ি তো থাকবেই, এই হোটেলের প্রত্যেকটা ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিও দেবেন এর কাছে। কেউ যেন কোনও ডিসটার্ব না করে সেদিকে দেখবেন। কোনও চাকরকে ঘেঁষতে দেবেন না ওখানে। নিজ হাতে খাবার পৌঁছে দেবেন ওর ঘরে। মোট কথা ওর উপস্থিতি যেন কেউ টের না পায়।

সব কথা পরিষ্কার বোঝা গেল?'

'নিশ্চয়ই, স্যার। আপনি যা আদেশ করবেন তার একচুল এদিক ওদিক হবে না। যেমন বলবেন তেমনই হবে, স্যার।'

'আর ওই উল্লুকে পাট্ঠাকে সাবধান করে দেবেন যেন মুখ বন্ধ রাখে। নইলে জিভ কেটে নেব। এখন ঘরটায় নিয়ে চলুন আমাদের, কুইক।'

চলে গেল মাহমুদ। ডক্টর সেলিমকে কোন্ হোটেলে ওঠানো হয়েছে, রুম নাম্বার কত জেনে দেবার চেষ্টা করবে কথা দিল। খবরটা জানাবে টেলিফোনে। কিভাবে সাঙ্কেতিক ভাষায় খবরটা দেবে তাও বলে দিল। দুই দিন, বড়জোর তিন দিন থাকা যাবে এই হোটেলে, তারপর পরিচয় বদলে নিয়ে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। খবরটা পর্যন্তই আপাতত সাহায্য করতে পারবে মাহমুদ, ডক্টর সেলিমের সাথে দেখা করে সব ব্যবস্থা ঠিক করবার দায়িত্ব রানার। আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাল ওকে রানা।

মাহমুদ বেরিয়ে যেতেই রাজ্যের ক্লান্তি এসে চেপে ধরল রানাকে। দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে চাবিটা রেখে দিল সে গর্তের মধ্যে যাতে বাইরে থেকে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে কেউ খুলতে না পারে। একটা চেয়ার টেনে এনে হাতলের সাথে বাধিয়ে রাখল আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্যে। তারপর কাপড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়, ঢলে পড়ল ঘুমের কোমল আলিঙ্গনে। ডান হাতটা বালিশের তলায় পিস্তলের বাঁটের ওপর রাখা।

পরদিন বেলা বারোটায় ঘুম ভাঙল ওর। লম্বা বিশ্রাম পেয়ে চাঙ্গা বোধ করল সে। প্রকাণ্ড হাই তুলে উঠে পড়ল ও বিছানা ছেড়ে। বাথরুমে গিয়ে ঢুকল টেলিফোনে খাবারের অর্ডার দিয়ে। একেবারে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে বেরোল রানা বাথরুম থেকে। ঝরঝরে লাগছে শরীর-মন। জানালার ভারি পর্দা সরিয়ে দেখল থমথম করছে আকাশের মুখ। তুষার ঝরছে এখনও।

দরজায় টোকা পড়তেই হাতলের নিচ থেকে চেয়ারটা সরিয়ে দরজা খুলে দিল রানা। ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল ম্যানেজার স্বয়ং। খাবার নামিয়ে রেখে একটা খাম বের করল সে পকেট থেকে।

'আপনার চিঠি, স্যার।'

'আমার চিঠি? কখন এসেছে?' ধমকের সুরে বলল রানা।

'মিনিট পাঁচেক আগে।'

'পাঁচ মিনিট আগে?' ক্রুদ্ধ চোখে চাইল রানা ম্যানেজারের দিকে। 'পাঁচ মিনিট আগেই এটা নিয়ে আসেননি কেন?'

'মাফ চাই, স্যার। আপনার খাবার প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল, আমি···আমি ভাবলাম···'

'আপনি ভাবলেন! আপনাকে কে ভাবতে বলেছে? ভবিষ্যতে কোনও ভাবনা-চিন্তা না করে কোনও সংবাদ এলে তৎক্ষণাৎ জানাবেন আমাকে। কে নিয়ে এসেছে চিঠিটা?'

'একটা মেয়ে—একজন ভদ্রমহিলা।'

'দেখতে কেমন?'

'রেনকোট পরা ছিল, মাথার হুড দিয়ে অর্ধেকটা মুখ ঢাকা ছিল, ভাল করে দেখতে পারিনি। কিন্তু খুব সুন্দরী মনে হলো। চিবুকে একটা তিল ছিল। আর কিছুই লক্ষ করতে পারিনি।'

'এই বুদ্ধি নিয়ে হোটেল চালান? যান এখন, আধঘণ্টা পরে আসবেন।'

রানা ভাবছে, রুবিনাকে পাঠাল কেন জিঞ্জির? কোন দুঃসংবাদ আছে নাকি? খামের ওপর কিছু লেখা নেই। ছিঁড়ে বের করল ছোট্ট চিঠি একটা। লেখা:

বাসায় আসবেন না। আটটা থেকে নয়টার মধ্যে
আমার সাথে কাফে ডি পার্লে দেখা করবেন।

'আর'

অর্থাৎ রুবিনা। প্ল্যান মাফিক সেলিম খানের সাথে দেখা করে জিঞ্জিরের ওখানে যাওয়ার কথা ছিল রানার। হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন? যাক্, দেখা হলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। চিঠিটা পুড়িয়ে ছাইটা গুঁড়ো করে কমোডে ফেলে চেন টেনে দিল সে। তারপর খেয়ে নিল চমৎকার একপ্রস্থ লাঞ্চ।

সারাদিন অপেক্ষা করল রানা। তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা বেজে যাচ্ছে তাও মাহমুদের ফোন আসার নাম নেই। জামা-কাপড় পরে নিয়ে একঘেয়ে অপেক্ষা করতে করতে নানা রকম দুশ্চিন্তা আসতে আরম্ভ করল রানার মনে। ধরা পড়ে গেল না তো ফজল মাহমুদ? সমস্ত কাজ পড়ে আছে, এখনও দেখাই হয়নি সেলিম খানের সঙ্গে। বেরিয়ে পড়বে নাকি সে হোটেল থেকে? এমনও হতে পারে হয়তো খবর বের করতে পারেনি সে। কিন্তু একবার ফোন করে সে-কথা জানিয়ে দিলেই তো চুকে যেত।

ছ'টা বেজে দশ মিনিটে বেজে উঠল ফোন। ছুটে গিয়ে তুলে নিল রানা রিসিভার।

'মি. হারুন বলছেন?' মাহমুদের কণ্ঠ চিনতে পারল রানা।

'হ্যাঁ,' 'এইচ' লেখা হোটেলটায় টিক চিহ্ন দিল রানা।

'আপনার জন্যে চমৎকার খবর আছে, মি. হারুন। মিনিস্ট্রির সাথে কথা হয়েছে। চীফ সেক্রেটারি আপনাদের মাল নিতে রাজি হয়েছেন—কিন্তু দামের ব্যাপারে ৭৮-এর বেশি উঠতে রাজি নন। দেখেন এখন আপনি নিজে আলাপ করে কিছু বাড়াতে পারেন কিনা। আমার কমিশনের কথাটা কিন্তু ভুলবেন না।'

'সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তাহলে আজ সাতটার দিকে আসুন, ডিনার খাওয়া যাক একসাথে?'

'ঠিক আছে। আমি আসছি। চার তলায় তো?'

'তিন তলায়। আচ্ছা, দেখা হবে।' ফোন নামিয়ে রাখল মাহমুদ। খুব তাড়াহুড়ো করে খবরগুলো দিল সে যদিও, কিন্তু সব কথাই আছে এর মধ্যে। হারুনের 'এইচ' মানে ইম্পিরিয়াল হোটেল, ৭৮ মানে রুম নম্বর ৮৭—উল্টে নিতে হবে। সাতটার সময় ডিনার খাবেন ডক্টর সেলিম খান। হোটেলের তিন তলায় ওঁর কামরা। আগেই শুনেছে সে এ-আররিকে প্রহরী দিয়ে অত্যন্ত সুরক্ষিত করা হয়েছে এই হোটেল। দেখা যাক, কি হয়।

রেনকোট পরে নিল রানা। টুপিটা টেনে দিল সামনে। প্যান্টের ডান পকেটে রাখল ওর সাইলেন্সার ফিট করা ওয়ালথার পি. পি. কে। বাম পকেটে রাবার মোড়া একটা শক্তিশালী পেন্সিল টর্চ। পিস্তলের জন্যে দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন রাখল সে কোটের পকেটে। তারপর ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রেখেই বেরিয়ে এসে তালা লাগিয়ে দিল। সরু করিডর দিয়ে হোটেলের একপাশে সুইপার প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। ওখান থেকে উঠল বড় রাস্তায়।

সারা রাস্তা আধ ফুট উঁচু তুষারে ছাওয়া। প্রায় জনশূন্য। অল্পক্ষণেই রানার টুপি আর রেনকোটও সাদা হয়ে গেল তুষার জমে। ঝুরঝুর, অবিরাম ঝরেই চলেছে তুষার আজ দু'দিন ধরে। ভালই হয়েছে, নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে কেউ বেরোবে না আজ বাড়ি থেকে। তাছাড়া রানার পায়ের শব্দটাও ঢাকা পড়বে তুষারের শব্দে। আজ রাত শিকারীর রাত, ভাবল রানা।

মিনিট পনেরো হাঁটতেই এসে গেল ইম্পিরিয়াল হোটেল। রাস্তার অপর পাশ দিয়ে ফুটপাথ ধরে চলে গেল রানা হোটেলটা পেরিয়ে। প্রকাণ্ড হোটেল। গেটে দু'জন প্রহরী দাঁড়ানো। দু'জনেরই কোমরে রিভলভার। ওরা যে হোটেলের কর্মচারী নয় সেকথা চোখ বন্ধ করেই বলে দেয়া যায়। এ-আরবিকে-র লোক।

রানা বুঝল, সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। প্রহরী দু'জনের চোখের আড়ালে এসেই রাস্তা পার হয়ে ফিরে এল রানা হোটেলের কাছাকাছি। নাহ্, পাশ দিয়ে ঢুকবারও কোনও ব্যবস্থা নেই। একতলার জানালাগুলোতে মোটা লোহার শিক লাগিয়ে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে। একটাও পাইপ নেই যে বেয়ে উঠবে। এখন একমাত্র ভরসা পেছন দিক।

হোটেলের গা ঘেঁষে এগিয়ে গেল রানা দ্রুত পায়ে। একটা খিলান দেখা গেল হোটেলের পেছনে। কর্মচারীরা আসা যাওয়া করে এই পথে। বাজার বোঝাই ঠেলাগাড়িও যাতায়াত করে। গেটটা খোলা। হোটেলের পেছনে বেশ খানিকটা জায়গা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। খিলানে এসে মিশেছে সে দেয়াল। বরফ ঢাকা প্রাঙ্গণ দেখতে পেল রানা। নিশ্চয়ই এখানেও প্রহরী আছে। থাকতেই হবে। দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে সাবধানে এগোল রানা গেটের দিকে। হোটেলের পেছনে দুইকোণে দুটো উজ্জ্বল ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে। তারই আলোয় ম্লান ভাবে আলোকিত সারাটা প্রাঙ্গণ।

খিলানের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। কিন্তু ভেতরটা দেখবার জন্যে মাথাটা সামনে বের করতেই চোখ ঝলসে গেল ওর উজ্জ্বল একটা টর্চের আলোয়। দুই সেকেণ্ড কিছুই দেখতে পেল না রানা চোখে। বুঝল ধরা পড়ে গেছে সে। সাইলেন্সার ফিট্ করা পিস্তলটা ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। কিন্তু আলোটা ওর ওপর থেকে সরে চলে গেল প্রাঙ্গণের অন্য প্রান্তে।

এবার বুঝল রানা ব্যাপারটা। সাব-মেশিনগান হাতে একজন প্রহরী আঙিনাটায় রাউণ্ড দিচ্ছে। অসতর্ক ভাবে ওর হাতে ধরা টর্চের আলোই পড়েছিল রানার মুখের ওপর, কিন্তু ওর চোখ দুটো টর্চের আলো অনুসরণ করছে না বলেই দেখতে পায়নি সে রানাকে। ঘুরে চলে যাচ্ছে সে আরেক দিকে। আরেকটু গেলেই আড়াল হয়ে যাবে। আর দেরি করা ঠিক নয়।

খিলানের হোয়াইট-ওয়াশ করা দেয়াল ঘেঁষে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল রানা। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে বজ্রাহতের মত। সেঁটে গেল দেয়ালের সঙ্গে। সাঁ করে একটা সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে ফেলেছে কেউ। তিন হাত তফাতে তুষারের ওপর পড়ে নিভে যাচ্ছে ওটা এখন। ভয়ার্ত দৃষ্টি তুলে দেখল রানা খিলানের পরেই একটা সেন্ট্রি বক্স। যদি দৈবক্রমে সিগারেটটা না ফেলত তাহলে এতক্ষণে ওই প্রহরীর হাতে ধরা পড়ে যেত সে। আরও অনেক সাবধান হওয়া উচিত ছিল ওর। মাত্র চারফুট দূরে একজন সেন্ট্রির দেহের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। একটু ঘুরলেই দেখে ফেলবে রানাকে। যদি ও না-ও তাকায় তাহলে ওর সাথীর টর্চে ধরা পড়বে সে বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে। রানা বুঝল তিনটে পথ আছে। যদি ঘুরে দৌড় দেয় তাহলে এই অন্ধকারে তুষারপাতের মধ্যে ওকে ধরতে পারবে না প্রহরীরা। কিন্তু তাহলে প্রহরার ব্যবস্থা আরও শক্ত হয়ে যাবে—ডক্টর সেলিমের সাথে দেখা করাই আর হয়ে উঠবে না। আর যদি দু'জন প্রহরীকেই ও হত্যা করে, মৃতদেহ লুকাতে পারবে না কোথাও। ও হোটেলের মধ্যে থাকতেই যদি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় তাহলে আর জ্যান্ত বেরোতে হবে না হোটেল ইম্পিরিয়াল থেকে। কাজেই তৃতীয় পথই এখন একমাত্র ভরসা। তাছাড়া আর চিন্তা করবার সময়ও নেই।

পিস্তলটা হাতেই ছিল। আর মাত্র আট দশ ফুট দূরে আছে টর্চ হাতে প্রহরী। সেন্ট্রি-বক্সের প্রহরীটা ওকে কিছু বলবে বলে একটু কেশে পরিষ্কার করে নিল গলাটা। সাথে সাথেই ট্রিগার টিপল রানা।

সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের 'দুপ' শব্দটা ঢাকা পড়ে গেল বাম দিকের উজ্জ্বল বাল্‌বটা ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ায়। পিস্তলের শব্দটা শুনতেই পেল না প্রহরী। ওরা দু'জনেই ছুটল নিভে যাওয়া আলোটার দিকে। রানাও একছুটে এসে দাঁড়াল জমাদার ওঠার লোহার ঘোরানো সিঁড়ির কাছে। একেকবারে দুই ধাপ করে টপকে উঠে এল সে তিনতলার বাথরুমের দরজার সামনে। ওখান থেকেই শুনতে পেল প্রহরী দু'জনের আলাপ। অতিরিক্ত শীতে যে ভেঙে গেছে বাল্‌বটা তাতে ওদের কোনও সন্দেহ নেই। তবু ভালভাবে একপাক ঘুরে দেখল ওরা আঙিনাটা, বাইরে বেরিয়ে এদিক-ওদিক টর্চ ফেলে নিশ্চিন্ত হলো।

বাথরুমের দরজা বন্ধ। ওপাশ থেকে তালা দেয়া। কয়েকটা চাবি লাগাতেই খুলে গেল তালা। নিঃশব্দে ভেতরে চলে এল রানা। অন্ধকার। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে লাইটের সুইচ পেয়ে গেল সে। একবার ভাবল পর্দাগুলো টেনে দেবে কিনা লাইট জ্বালাবার আগে। পরমুহূর্তে বুঝল লাইট দেখলেও সেন্ট্রিদের সন্দেহ করবার কোনও কারণ নেই। প্রকৃতির ব্যাপার—তাছাড়া সাইন্টিস্টদেরও পেট খারাপ হয়—যখন-তখন এই ঘরের বাতি জ্বলতে পারে। বিনা দ্বিধায় লাইট জ্বেলে দিল রানা।

বেশ বড়সড় বাথরুম। প্রথমেই বেসিন ভর্তি করল সে গরম পানিতে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া হাত দুটো ডুবিয়ে রাখল ওতে কিছুক্ষণ। আবার রক্ত চলাচল আরম্ভ হলো ওর আঙুলগুলোয়। ঝিঁঝি ধরার মত একটা তীক্ষ্ণ চিনচিনে ব্যথা সহ্য করল সে দাঁতে দাঁত চেপে। আঙুলগুলোয় আবার সাড়া ফিরে আসতেই তোয়ালে দিয়ে মুছে নিল হাত দুটো। তারপর লাইট নিভিয়ে দিয়ে দরজাটা খুলে সামান্য একটু ফাঁক

করে চোখ রাখল সেই ফাঁকে।

দেখল একটা লম্বা কার্পেটে ঢাকা করিডরের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সে। করিডরের দুই ধারেই সারি সারি দরজা। একটা দরজায় নম্বর পড়ল রানা—৮১, তার পাশেরটা—৮২। ভাগ্যক্রমে ডক্টর সেলিমের কামরার কাছাকাছিই এসে গেছে সে। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। আজকে তাহলে ভাগ্যটা গত কালকের মত খারাপ ব্যবহার করছে না। কিন্তু করিডরের শেষে তাকিয়েই মুখটা শুকিয়ে গেল ওর। চট করে পিছিয়ে এল সে, আস্তে বন্ধ করে দিল দরজা। করিডরের আরেক মাথায় রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে একজন রিভলভারধারী এ-আরবিকে গার্ড।

বাথটাবের কিনারে বসে পড়ল রানা। বুদ্ধি বের করতে হবে। গার্ডটা ওখান থেকে নড়বে বলে মনে হয় না। আর ওখানে থাকলে রানা ৮৭ নম্বর ঘরে ঢুকতে পারবে না।—কাজেই সরাতে হবে ওকে। কিন্তু কিভাবে? এত লম্বা আলোকিত করিডর দিয়ে এতদূর গিয়ে ওকে কাবু করা অসম্ভব। আত্মহত্যারই সামিল। ওকে এখানে আনতে হবে। এমন ভাবে আনতে হবে যাতে কোনও সন্দেহ করতে না পারে। হঠাৎ উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার মুখ। ধূর্ত ফজল মাহমুদও প্রশংসা না করে পারবে না।

রেনকোট, টুপি, ওভার কোট, টাই খুলে ফেলল রানা। বাথটাবে লুকিয়ে রাখল। তারপর শার্টের ওপরের দিকের তিনটে বোতাম খুলে দিয়ে সারা মুখময় আচ্ছামত সাবান ঘষে ফেনা তুলে ফেলল। কারণ শ্রীনগরের প্রত্যেকটি এ-আরবিকে অফিসারের কাছে ওর চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এবার দুই হাত ধুয়ে-মুছে নিল তোয়ালেতে। বাম হাতে পিস্তলটা ধরে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে নিয়ে দরজা খুলে ফেলল। নিচু ফ্যাসফেঁসে গলায় ডাকল ওকে, 'এ···ই!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল গার্ডটা। রিভলভারের বাঁটে চলে গেছে ওর ডান হাত। কিন্তু বাথরুমের দরজায় তোয়ালে হাতে মুখে সাবান মাখা একজন নিরীহ ভদ্রলোককে দেখে সরিয়ে নিল হাতটা। ইশারায় ডাকল রানা ওকে। কিছু বলবার জন্যে হাঁ করেছিল, তর্জনী ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে ওকে কথা বলতে নিষেধ করল রানা। বোবার ভাষায়। একটু দ্বিধা করল গার্ডটা, কিন্তু যখন দেখল দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওকে কাছে যাওয়ার ইঙ্গিত করছে লোকটা পাগলের মত, তখন দৌড়ে এগিয়ে এল সে। রানার কাছে পৌঁছবার আগেই রিভলভার বের করে ফেলেছে সে হোলস্টার থেকে।

'ওই দরজার বাইরে একজন লোক আছে!' ফিসফিস করে চাপা উত্তেজিত গলায় বলল রানা গার্ডের কানে কানে। 'দরজা খোলার চেষ্টা করছে লোকটা।'

'সত্যিই? আপনি দেখেছেন ওকে?'

'দেখেছি। আমাকে ও দেখতে পায়নি।' তোয়ালের তলা থেকে রানার পিস্তল চলে এল ডান হাতে।

গার্ডের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। পুরু ঠোঁট দুটোতে ফুটে উঠল একটুকরো হাসি। ওর মনের মধ্যে তখন প্রমোশন, বাহবা ইত্যাদির চিন্তা ছুটোছুটি করছে। একটুও সন্দেহ করল না রানাকে। এক হাতে ঠেলা দিয়ে রানাকে

একপাশে সরিয়ে বাথরুমের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। রানার ডানহাতটা তোয়ালের নিচে থেকে সরে গেল—গার্ডের পেছন পেছন সে-ও এগোল।

পা ভাঁজ হয়ে যেতেই ধরে ফেলল রানা গার্ডটাকে, আস্তে নামিয়ে দিল মেঝের ওপর। হাত-পা বেঁধে জ্ঞানহীন গার্ডের মুখের ভেতর একটা রুমাল ভরে বেঁধে ফেলল মুখটা বাইরে থেকে। তারপর নিজের জামা-কাপড় তুলে মেঝেতে রেখে সযত্নে শুইয়ে দিল ওকে বাথটাবের ভেতর।

দুই মিনিট পর টুপিটা হাতে নিয়ে, ওভারকোটটা বাম বাহুতে ভাঁজ করে ঝুলিয়ে, যেন একজন হোটেল গেস্ট বাথরুম সেরে ঘরে ফিরছে এমনি ভাবে বেরিয়ে এল রানা করিডরে, গিয়ে দাঁড়াল ৮৭ নম্বর কামরার সামনে। কিন্তু একটা চাবিও লাগল না দরজায়।

পাশের নম্বর ছাড়া দরজা—অর্থাৎ অ্যাটাচড্ বাথরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। এটাতেও তালা দেয়া। এবং এবারও চাবি দিয়ে খুলতে পারল না রানা দরজাটা। কিন্তু যে-কোনও দরজার তালা খুলবার জন্যে স্পেশাল ট্রেনিং দেয়া হয়েছে ওকে পি.সি.আই. থেকে। চারকোনা একটা পাতলা সেলুলয়েডের টুকরো বের করল সে পকেট থেকে। দরজার ফাঁক দিয়ে সেটা ঢুকিয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডেলটা ধরে হিঞ্জের দিকে টান দিল সে, তারপর বল্টুতে একটা চাড় দিতেই ক্লিক করে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা।

বেডরুমের চাবির ফুটোয় চোখ রেখে দেখল রানা সে-ঘরটাও অন্ধকার। আস্তে দরজা খুলে পেন্সিল টর্চটা বুলাল সে সারা ঘরে। খালি। নিঃশব্দ পায়ে জানালাগুলো পরীক্ষা করে দেখল রানা—একবিন্দু আলোও বাইরে যাবার উপায় নেই। নিশ্চিন্তে জ্বেলে দিল সে ঘরের বাতি। দরজার হ্যাণ্ডেলে টুপিটা ঝুলিয়ে দিল যাতে চাবির ফুটো দিয়ে বাইরে আলো না যেতে পারে।

সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। দেয়াল, টাঙানো ছবি, ভেন্টিলেটার—কোনও জায়গা বাদ রইল না। লুকানো মাইক্রোফোনটা বের করতে ওর তিন মিনিট সময় লাগল—সেই সাথে বোঝা গেল ঘরে স্পাই হোল নেই কোনও। বাথরুমে কোনও মাইক্রোফোন পেল না সে। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। একেবারে কাছে। কার্পেট বিছানো থাকায় আগে থেকে টের পায়নি সে। দৌড়ে বেডরুমে চলে এল সে। লাইট নিভিয়ে দিল। দু'জন লোক কথা বলছে দরজার ওপাশে। টুপিটা তুলে নিয়ে ছুটে চলে গেল সে বাথরুমের মধ্যে। দরজাটা একটু ফাঁক রেখে চোখ রাখল বেডরুমের দিকে।

বহু ছবি দেখে দেখে চেহারাটা মুখস্থ হয়ে গেছে রানার—চিনতে অসুবিধে হলো না, ঘরে ঢুকলেন ডক্টর সেলিম খান। তাঁর পিছনে ঢুকল গাঢ় নীল স্যুট পরা একজন লম্বা লোক। ইউরোপীয়ান। নিশ্চয়ই নামজাদা কোনও বৈজ্ঞানিক হবে। দু'জন দুটো সোফায় চেপে বসে হৈ-হৈ করে গল্প জুড়ে দিল। দুর্বোধ্য সব কথাবার্তা। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। উঠবার নামও নেই।

নীল স্যুটওয়ালাকে এখান থেকে ভাগাতে হবে, ভাবল রানা।

পাঁচ

নিজের অজান্তেই পিস্তলটা বের করে হাতে নিয়েছিল রানা ছুটে বাথরুমে ঢোকার সময়। বাম হাতে নিল সে সেটাকে। ঘড়ির দিকে চোখ যেতেই চমকে উঠল। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সময়।

আধ ডজন প্ল্যান এল মাথার মধ্যে—সবগুলোকে বাতিল করে দিল সে। কোনও ঝুঁকি নেয়া চলবে না। সেলিম খানের প্রাণের মূল্য অনেক বেশি। তাঁর ব্যাপারে কোনও বিপদের ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না।

শেষ পর্যন্ত একটা প্ল্যান মোটামুটি পছন্দ হলো ওর। বাথরুমের দিকে মুখ করে বসে ছিলেন সেলিম খান। বাথরুমের দরজার ঠিক উল্টোদিকে দেয়ালে ঝোলানো একটা বড় আয়না। নিঃশব্দে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। লাক্স সাবান তুলে নিয়ে আয়নার ওপর গোটা গোটা করে লিখল:

আমি পাকিস্তান থেকে এসেছি।

সাথের লোকটিকে বিদায় করুন।

এবার বাথরুম থেকে করিডরে বেরোবার দরজা খুলল সে সাবধানে। মাথা গলিয়ে দেখল কেউ নেই করিডরে। বাইরে বেরিয়ে ডক্টর সেলিমের বেডরুমের দরজায় দুটো টোকা দিয়েই আবার এসে বাথরুমে ঢুকল রানা।

নীল স্যুট পরা লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে, দরজা খুলতে যাচ্ছে সে। মাথাটা ঢোকাল রানা বেডরুমের মধ্যে, এক আঙুল ঠোঁটের ওপর রেখে একমুহূর্তের জন্যে পেন্সিল টর্চের আলোটা ফেলল সেলিম খানের চোখে। চমকে চাইলেন সেলিম খান, দরজা দিয়ে বেরিয়ে থাকা রানার মুখটা দেখলেন। ঠোঁটের ওপর আঙুল থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সামলাতে পারলেন না তিনি, প্রায় অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল ওঁর মুখ থেকে। নীল স্যুট পরা লোকটা দরজা খুলে ফাঁকা করিডরে এদিক-ওদিক চাইছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো, প্রফেসর খান?'

সেলিম খান ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। আয়নার ওপরের লেখাটাও দেখে নিয়েছেন রানার টর্চের আলোয়।

'নাহ্, এমন কিছু নয়। সেই মাথার যন্ত্রণাটা। হঠাৎ করে বেড়ে ওঠে। কেউ নেই বাইরে?'

'নাহ্, কেউ নেই। অথচ আমি স্পষ্ট···আপনি কি খুব খারাপ বোধ করছেন, প্রফেসার?'

'ঠিক হয়ে যাবে। একটা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়লেই সেরে যাবে।'

'ডাক্তারকে খবর দেব?'

'না-না! কোনও দরকার নেই। প্রায়ই হয় এরকম, ট্যাবলেটেই সেরে যায়। বিধানচন্দ্রের প্রেসক্রাইব করা ট্যাবলেট। আপনার সাথে আলাপটা বেশ জমে উঠেছিল, অথচ···'

'তাতে কি আছে, কাল আবার গল্প করা যাবে। আজ আসি তাহলে!'

বেডরুমের দরজাটা ক্লিক করে লেগে যেতেই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সেলিম খান, হাতের ইশারায় থামতে বলল রানা। বেডরুমে এবং বাথরুমের দরজায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে বাথরুমে নিয়ে এল রানা সেলিম খানকে। মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আলো জ্বেলে দিল বাথরুমের।

'কে তুমি? কি করছ আমার কামরায় ঢুকে?'

'আমার নাম মাসুদ রানা। পাকিস্তান থেকে এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আপনার সাথে কিছু কথা আছে।'

'তা বাথরুমে দাঁড়িয়ে কি কথা? ঘরে গিয়ে বসে…'

'ওই ঘরে কথা বলা যাবে না। ভেন্টিলেটারের ওপর লুকানো মাইক্রোফোন আছে ও ঘরে।'

'কি আছে বললে? মাইক্রোফোন? তা তুমি জানলে কি করে?' অবাক হয়ে ভুরু জোড়া উঁচু করলেন সেলিম খান।

'আপনি ঘরে ঢুকবার আগেই আমি ঘরটা পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'আচ্ছা! এই জন্যেই আমাকে অন্যান্য সাইন্টিস্টদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিয়েছে? তাই ভাবছিলাম, হঠাৎ এমন উদার হয়ে উঠল কেন আমার দেহরক্ষীরা। যাক, কিজন্যে দেখা করতে এসেছ? চারদিকে কড়া পাহারা। তোমার প্রাণের ভয় নেই, ইয়াংম্যান? ধরা পড়লে কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ?'

'আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি।'

'তুমি ছেলেমানুষ—তুমি আমাকে নিয়ে যাবে কি হে? তুমি পারবে? তাছাড়া আমার স্ত্রী? ওকে ছাড়া এক পা-ও তো নড়ব না আমি। ও দিল্লীতে পড়ে থাকবে আর আমি সুযোগ পেয়ে চলে যাব পাকিস্তানে…'

'তারও ব্যবস্থা হয়েছে,' বাধা দিল রানা। দ্রুত কথাবার্তা সারতে হবে। 'এতক্ষণে তিনি বর্ডারের কাছাকাছি। উনি নিরাপদে বর্ডার পেরোলেই জানতে পারব আমরা।'

'কিভাবে?'

আজ হোক বা আগামীকাল হোক ঠিক রাত দশটায় করাচী রেডিও থেকে. যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন রাত নয়টা পাঁচ থেকে নয়টা সাত মিনিট পর্যন্ত শর্ট ওয়েভে অনুষ্ঠান প্রচার করা সম্ভব হয়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করা হবে। তার মানে আপনার স্ত্রী নিরাপদে পাকিস্তানে পৌঁছেছেন। হয়তো তার আগেই আমরাও বর্ডার ক্রস করতে…'

'আমার তা মনে হয় না, মিস্টার মাসুদ রানা। প্রথম কারণ, পুলিসের চব্বিশ ঘণ্টা প্রহরার মধ্যে থেকে আমার স্ত্রীকে বের করে নিয়ে এদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর দ্বিতীয় কারণ, ওই সংবাদটা না পেলে আমি রওনাই হব না।'

আজই সেলিম খানকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারলে সবচাইতে ভাল হত। কিন্তু এ ব্যাপারে চাপাচাপি করতে আগেই নিষেধ করে দেয়া হয়েছে রানাকে। ডক্টর সেলিম যে স্ত্রীর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে রানার প্রস্তাবে

রাজি হবেন না, একথা জানাই ছিল। সেইমত প্ল্যানও করা আছে। প্ল্যানটা ভেঙে বলল রানা। এবং সবশেষে বলল জিঞ্জিরের ঠিকানাটা। কয়েকবার সজোরে আবৃত্তি করে মুখস্থ করে নিলেন ডক্টর সেলিম ঠিকানাটা। কোনও অবস্থাতেই ঠিকানাটা প্রকাশ করবেন না বলে কথা দিলেন। সস্ত্রীক পাকিস্তানে চলে আসতে পারবেন, ছেলেদের সঙ্গে আবার মিলিত হতে পারবেন, সেই সুখ-কল্পনায় বিভোর হয়ে গেলেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক। রানা ঘড়ি দেখল: পৌনে আটটা। কাফে ডি পার্লে যেতে হবে।

ডক্টর সেলিমের কামরার গরাদহীন জানালা গলে কয়েকটা বিছানার চাদর গিঁট দিয়ে বানানো দড়ি বেয়ে নেমে এল রানা হোটেলের ডান পাশে রাস্তার ওপর। চাদরগুলো গুটিয়ে নেবার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল রানা অবিরাম তুষার আর অন্ধকারের মধ্যে।

ঠিক সাড়ে আটটায় পৌঁছল ও কাফে ডি পার্লে। নাগিন লেকের ধারে চমৎকার ছিমছাম রেস্তোরাঁ। ভেতরটায় লোকজন গমগম করছে। ঠাণ্ডা জনশূন্য রাস্তা পেরিয়ে এতদূর এসে হঠাৎ অবাক লাগে। ঘরটা কেবল সরগরমই নয়, উত্তপ্ত হয়ে আছে।

ঢুকেই একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল রানা, কিন্তু সে কেবল এক সেকেণ্ডের দশভাগের এক ভাগ মাত্র। তারপরই হাঁটতে আরম্ভ করল আবার। চার-পাঁচজন সোলজার বসে আছে দরজার কাছেই একটা টেবিলে।

অল্পদূর এগোতেই চোখ পড়ল ওর রুবিনার ওপর। কোণের একটা টেবিলে বসে আছে সে। একা। চোখে চোখ পড়ল, কিন্তু যেন চিনতেই পারেনি এমনি ভাবে চোখ ফিরিয়ে নিল রুবিনা। বুঝল রানা ব্যাপারটা। আশপাশের সব টেবিলেই লোক ভর্তি, কিছুক্ষণ ইতস্তত করবার ভান করে রুবিনার টেবিলের দিকে এগোল রানা।

'আপনার টেবিলে বসতে পারি?'

জবাব দিল না রুবিনা। চোখে চোখে চাইল একবার, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দূরের একটা খালি টেবিলের দিকে চাইল বিরক্ত মুখে। বসে পড়ল রানা সামনের চেয়ারে। বুঝল আশপাশের টেবিল থেকে কয়েকজন ঈর্ষান্বিত যুবক লক্ষ করছে ওকে।

'কি ব্যাপার?' ফিস ফিস করে বলল রানা।

'আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে।'

'এখানে আছে?'

চোখের পাতা একটু নামাল। রানা বুঝল এই কাফেতেই আছে অনুসরণকারী।

'কোনখানটায়?'

'সোলজারগুলোর পাশের টেবিলে।'

'চেহারাটা বর্ণনা করুন,' পিছনে না ফিরে বলল রানা।

'কালো রেনকোট, গোল মুখ, থুতনিতে সামান্য দাড়ি আছে, লম্বায় মাঝারি।' কথাগুলোর সঙ্গে রুবিনার মুখের চেহারার কোনও সামঞ্জস্যই নেই। মুখের ভাবে

ফুটে উঠেছে স্পষ্ট বিরক্তি। অভিনেত্রীই বটে। হাসি পেল রানার, কিন্তু হাসল না।

'ওকে খসিয়ে না দিতে পারলে কথা বলা যাবে না। বেরোতে হবে এখান থেকে। আগে আপনি, তারপর আমি।' টেবিলের ওপর রাখা রুবিনার হাত ধরে চাপ দিল রানা। ঝুঁকে এল সামনের দিকে। 'আমি এই মাত্র জঘন্য একটা প্রস্তাব দিলাম আপনাকে। কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে আপনার?'

'এই রকম।' এক টানে হাতটা ছাড়িয়ে নিল রুবিনা। চটাস করে চড় পড়ল রানার গালে। এত জোরে শব্দ হলো যে গোটা কাফের মৃদু গুঞ্জন আর কথাবার্তা স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই ফিরে চাইল এই টেবিলের দিকে। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল রুবিনা। টেবিলের ওপর থেকে হ্যাণ্ডব্যাগ আর গ্লাভস্ তুলে নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে কারও দিকে না চেয়ে হনহন করে চলল দরজার দিকে। এইবার যেন কোনও অদৃশ্য সংকেতে হঠাৎ একসাথে মুখর হয়ে উঠল আবার সমগ্র রেস্তোরাঁ। চাপা হাসি আর মৃদু গুঞ্জনে ভরে গেল চারিটা দিক। টিটকারির বন্যা ছুটল রানার উদ্দেশে।

এক হাতে গালটা ঘষল রানা কিছুক্ষণ। ঘুরে দেখল সুইং-ডোরের পাল্লা দুটো দুলছে। বেরিয়ে গেছে রুবিনা। এবং প্রায় সাথে সাথেই কালো রেনকোট পরা একজন লোক উঠে দাঁড়িয়েছে, কাউন্টারে কিছু পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মেয়েটির পিছু পিছু।

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল রানা। অপমানিত, লজ্জিত চেহারা—রেনকোটের কলার উঠিয়ে দিয়ে টুপিটা একটু টেনে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করতে দেখে একেবারে হৈ-হৈ করে হেসে উঠল সব লোক। মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল রানা রাস্তায়। মেয়েটির বেশ খানিকটা পেছন পেছন হাঁটছে কালো রেনকোট পরা লোকটা।

রাস্তার মোড় ঘুরে কিছুদূর গিয়ে একটা বাসস্ট্যাণ্ডের অন্ধকার ওয়েটিং শেলটারে দাঁড়িয়ে পড়ল রুবিনা। লোকটাও চট করে একটা মস্ত চিনার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। ওকে ছাড়িয়ে রুবিনার কাছে চলে এল রানা।

'লোকটা ওই গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে,' বলল রানা। 'কতক্ষণ ধরে পেছনে লেগেছে ব্যাটা?'

'বাড়ি থেকেই। পঞ্চাশ গজ আসতেই টের পেলাম। তখন আর ফিরে যাওয়া যায় না। ছায়ার মত পেছনে লেগে গেছে একেবারে। এ-আরবিকে-র লোক সন্দেহ নেই।'

'ঠিক আছে। আপনার সম্ভ্রম রক্ষা করুন। প্রাণপণে একটা ফাইট দিন দেখি।'

'কিন্তু সাবধান!' ভয়ে শুকিয়ে গেছে রুবিনার মুখ। 'ভয়ঙ্কর লোক এরা···'

কথা শেষ হবার আগেই একটানে ফুটপাথের ওপর নিয়ে এল রানা রুবিনাকে। দুইহাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করছে সে রুবিনার ঠোঁটে। ওর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে রুবিনা পেছন দিকে হেলে। খোঁপা খুলে আলগা হয়ে গেছে। দুইহাতে কিল দিচ্ছে সে রানার পিঠে।

গাছের আড়াল থেকে দেখল লোকটা রুবিনার এই প্রাণপণ যুদ্ধ। কিছু সন্দেহ না করে বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল সে। রিভলভারটা উল্টো করে ধরে ওঠাল সে রানার মাথায় মারার জন্যে। ঠিক সময় মত মেয়েটির মুখ থেকে শব্দ

বোরোল একটা। অমনি ধাঁই করে রানার কনুইটা গিয়ে পড়ল লোকটার পেটের ওপর। পরমুহূর্তেই ঘুরে দাঁড়িয়ে খোলা হাতে মারল রানা ওর ঘাড়ের ওপর কারাতের এক কোপ। ধপাস করে পড়ে গেল লোকটা জ্ঞান হারিয়ে। প্রাণটা আছে না গেছে দেখল না রানা। টেনে নিয়ে গেল দেহটা ওয়েটিং শেলটারের ভেতর সবচাইতে অন্ধকার কোণটায়। রিভলভারটা রানার পকেটে চলে গেছে আগেই।

মোড় ঘুরে এগিয়ে চলল ওরা। দু'জন টহলদার পুলিস চলে গেল ওদের পাশ দিয়ে কাফে ডি পার্লের দিকে। ওদের দেখল একনজর, কিছু বলল না।

একবার শিউরে উঠল রুবিনা। অবাক হয়ে চেয়ে রইল রানা ওর দিকে। বিশাল লেকটা ঘুরে এসে কাফে ডি পার্লের ঠিক উল্টোদিকে ফিশারী ডিপার্টমেন্টের একটা ছাপড়ার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। অল্প জায়গার মধ্যে ঠাসাঠাসি করে বসেছে। মাছ ধরার টিকিট ইস্যু করবার কাউন্টার দিয়ে গজ বিশেক দূর থেকে ল্যাম্প-পোস্টের ম্লান আলো এসে পড়েছে রুবিনার গায়ে। কিন্তু মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

'এখনও শীত করছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, শীত ঠিক নয়, কেমন যেন একটা অস্বস্তি। এত নিষ্ঠুর হৃদয়হীন লোকের এত কাছাকাছি আমি জীবনে আর আসিনি কখনও। নিষ্ঠুর লোকদের আমি ভয় পাই।'

'আমাকে ভয় পাচ্ছেন? কিন্তু আমি তো আপনার কোনও ক্ষতি করিনি, করবও না।'

'সে আমি জানি।'

'ওই লোকটার কথা বলছেন? এছাড়া আর কিই বা করতে পারতাম আমি?'

'কিছুই না। জিঞ্জিরও এই কথাই বলে, মাহমুদও। আমি আপনাদের সবাইকে ভয় করি। কাজ উদ্ধারটাই আপনাদের কাছে বড় কথা। আপনারা যন্ত্র। বিনা দ্বিধায় খুন করতে পারেন আপনারা।' আরেকবার শিউরে উঠল সে। 'একজনকে মেরে বাথটাবে রেখে এসেছেন মুখে কাপড় গুঁজে, এতক্ষণে হয়তো মারাই গেছে বেচারা। আবার অল্পক্ষণ আগে আরেকজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে এলেন এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে। এক ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে এ-ও।'

'হোটেলের সেই লোকটাকে গুলি করে মারতে পারতাম, সাইলেন্সার লাগানো ছিল পিস্তলে—কিন্তু তা করিনি। আর এই লোকটাকে এছাড়া আর কি করতে পারতাম? আমি না করলে ও-ই আমার এই অবস্থা করত।'

চুপ করে রইল রুবিনা। রানা বুঝল, কিছুতেই ওর এইসব কাজ সমর্থন করতে পারছে না সে। ওর কোমল মনের পর্দায় এইসব ঘটনা বড় বেশি করে নাড়া দিচ্ছে। খোলা রাস্তার ওপর ভয়ঙ্কর শীতে টিকতে না পেরে চলে এসেছে ওরা এই ছাপড়ার আশ্রয়ে। সর্বশেষ সংবাদ নিয়ে এসেছে রুবিনা জিঞ্জিরের। খবরটা ভাল নয়। দু'জন গোয়েন্দা ঘুর ঘুর করছিল ওই বাড়ির আশপাশে ক'দিন ধরে। আজ খোলা গ্যারেজ দিয়ে ঢুকে পড়েছিল একজন। ধরে বেঁধে রেখেছে ওকে খামিসু খান। জিঞ্জিরের বাসায় আজ সন্ধ্যায় ডক্টর সেলিমের ব্যাপারে যে প্ল্যান ঠিক করবার কথা ছিল

তাতে বাধা নেই কোনও। কিন্তু জিঞ্জির বারবার করে বলে দিয়েছে রানা যেন রাত বারোটার আগে ওই বাড়িতে কিছুতেই না আসে। আর রানা রুবিনাকে বলেছে ওর দিকের সমস্ত সংবাদ। এ-আরবিকে গার্ড দু'জনকে ফাঁকি দিয়ে হোটেলে ঢোকা থেকে নিয়ে তিনতলার গার্ডকে অজ্ঞান করে ডক্টর সেলিমের সাথে দেখা করা পর্যন্ত সব।

'আপনার জন্যে এ জীবন নয়, মিস রুবিনা। আমার অবাক লাগছে ভাবতে, আপনি কেন বিপ্লবীদের দলে যোগ দিলেন। যাক সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি নিশ্চয়ই এ জীবন পছন্দ করেন না?'

'পছন্দ! কোন্ মেয়ে পছন্দ করবে এই জীবন? সব সময় ভয়, পালিয়ে বেড়ানো। যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও দিক থেকে আসতে পারে বিপদ, সব সময় চমকে তাকিয়ে দেখতে হচ্ছে কেউ আছে কিনা পেছনে। পেছনে তাকাতেও ভয় করছে, যদি সত্যিই কেউ থাকে! এমন জীবন...'

'আপনি যাবেন আমার সঙ্গে নিরাপদ কোনও দেশে?'

চট করে রানার দিকে ফিরল রুবিনা। বলল, 'না।'

'কেন?'

'যেতে পারব না। আমি চলে গেলে আমার আব্বাকে কে দেখবে?'

'আপনার আব্বা...' একটু বিস্মিত হলো রানা।

'আপনাকে নিশ্চয়ই বলেনি জিঞ্জির? কাউকেই বলে না। সবাইকে বলে আমি ওর শিষ্যা। পাছে কোনও ভাবে আমার কোনও ক্ষতি হয় তাই নিজের মেয়েকে মেয়ে বলে পরিচয় দিতে ভয় পায়। আর সব আপনজনের মত আমিও যদি ধরা পড়ে যাই, তবে আর কেউ থাকবে না যে আব্বার।'

'মেজর জেনারেল দিলদার বেগ আপনার আব্বা?'

'হ্যাঁ। আমিই ওঁর একমাত্র মেয়ে। আমার চার ভাই প্রাণ দিয়েছে এ-আরবিকে টরচার চেম্বারে আমার মাকে কঠোরতম নির্যাতন করা হয়েছে, চাবকে সারা শরীরের ছাল ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে একটা ঠিকানা বের করবার জন্যে, শেষ পর্যন্ত গুলি করে মারা হয়েছে গাছের গুঁড়ির সাথে বেঁধে, তবুও ভেঙে পড়েনি আমার আব্বা। তিনবার ধরা পড়েও পালিয়ে এসেছে ওদের হাত থেকে। ওদের নির্যাতনের দাগ কিছু কিছু আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। বাইরে থেকে সামান্যই দেখা যায়। জামা খুললে আঁৎকে উঠবেন আপনি। সারা গায়ে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে পেট্রল ঢেলে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল ওরা। সেই সব নির্যাতনের কথা আব্বা কিছুতেই বলেন না আমাকে—কিন্তু ভুলতেও পারেন না। এখনও মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে ওঠেন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে। বাম হাতের দুটো আঙুল কেটে পড়ে গেছে ওঁর জেলখানার কাচের টুকরো বসানো উঁচু দেয়াল টপকে পালাবার সময় দেয়ালের গায়ের শ্যাওলায় পা পিছলে গিয়ে। সেই অবস্থায় দেয়াল টপকে বারো মাইল দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গেছেন উনি। যার বাবা দেশের স্বাধীনতার জন্যে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, এত কঠোর নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করতে পারেন, তাঁর মেয়ে হয়ে পালিয়ে যাব কি করে?'

'আচ্ছা, মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আপনার আব্বার পরিচয় কি ভাবে? উনিও কি

ব্রিটিশ আর্মিতে ছিলেন?'

'না। ব্রিটিশ আর্মিতে আব্বার ডিভিশনে খামিসু খান ছিল হাবিলদার মেজর। ফজল ভাইয়া এসব লাইনেরই লোক না। বাটাকুটে ওঁর ছিল মস্ত জমিদারী। সে-সবকিছু ছারখার করে দিয়েছে ভারতীয় সৈন্যরা। বাড়িঘর লুটপাট করে জ্বালিয়ে দিয়েছে, মেয়েদের ওপর করেছে বর্বর অত্যাচার। ওঁর বাবা-মা ভাই-বোনকে অকথ্য নির্যাতন করে হত্যা করেছে। দাউ দাউ করে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে ওঁর বুকের ভেতর। কি শীতে কি গ্রীষ্মে আহার নেই বিশ্রাম নেই, পাগলের মত পরিশ্রম করেছেন উনি গোপনে বিপ্লবী দল গড়ে তোলার কাজে। ফলে ভয়ঙ্কর অসুখ হয়ে গেছে ওঁর—নাক মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে গল গল করে রক্ত পড়ে। ডাক্তার বলেছে যদি কমপ্লিট রেস্ট নেয় তাহলে বড়জোর আর দু'মাস বাঁচবে। তবুও বিশ্রাম নেবে না সে এক মুহূর্ত। অদ্ভুত লোক। পাঁচ বছর আগে আব্বার সঙ্গে একসাথে পালিয়ে এসেছে নয়াদিল্লীর কারাগার থেকে। সেই থেকে আর ছাড়াছাড়ি হয়নি দু'জনের।'

মন দিয়ে শুনছে রানা। চুপ করেই থাকল সে। অনেক কথা বলে গেল রুবিনা। কাশ্মীরী মুসলমানদের ওপর ভারত সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী, বিপ্লবীদের ব্যর্থ অভ্যুত্থান, আবার গোপনে দল গঠন, জিঞ্জিরের ভূমিকা, ফজল মাহমুদের ভূমিকা, নিজের ভূমিকা। শেষে থামল একটা ব্যক্তিগত প্রশ্নে এসে।

'বিয়ে করেননি বোধহয়, তাই না?'

'এ আবার কি প্রশ্ন?'

'ভয় নেই, আমার মতলব নেই কোনও। শুধুই কৌতূহল।'

'উত্তরটা তো নিজেই আঁচ করে নিয়েছেন। যে-কেউ পারবে আঁচ করতে। স্ত্রীলোক আর আমার জীবনযাত্রা পরস্পরবিরোধী।'

'জানি। আপনাকে অমানুষ, নিষ্ঠুর ইত্যাদি বলে কেন জানি আমার খুব খারাপ লাগছে। আপনি দুই-দুইবার আমাকে রক্ষা করলেন আজ সন্ধ্যায়—অমানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব হত না। আপনি যে সহানুভূতির সঙ্গে এতক্ষণ ধরে আমার বকর-বকর শুনলেন সেটাও অমানুষের কাজ নয়। গল্প বলতে বলতে আমি যখন কাঁদছিলাম আপনি সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমার কাঁধে হাত রেখেছিলেন, সেটাও অমানুষের কাজ নয়। কিন্তু এখন দয়া করে হাতটা না নামালে বাড়ি গিয়ে আয়োডেক্স মালিশ করলেও ব্যথাটা যাবে না। অবশ হয়ে গেছে কাঁধটা আমার।' খিল খিল করে হেসে উঠল রুবিনা।

'ছি ছি!' সত্যি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। নিজের অজান্তেই কখন যে রুবিনার কাঁধে হাত রেখেছে খেয়ালই করেনি সে এতক্ষণ। লজ্জিত হয়ে হাতটা উঠিয়ে নিচ্ছিল রানা। হঠাৎ বরফের মত যেন জমে গেল সে। চেপে ধরল সে কাঁধটা। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'ধরা পড়ে গেছি, রুবিনা। ঘরের বাইরে লোক।'

এক সেকেণ্ডে মনস্থির করে নিল রানা। ডান হাতে জড়িয়ে ধরল রুবিনার কোমর, তারপর চুম্বন করল ওর ঠোঁটে। প্রথমে বাধা দেবার চেষ্টা করল রুবিনা, ধাক্কা দিয়ে সরাবার চেষ্টা করল এই অসভ্য পাকিস্তানী স্পাইকে, কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝল ব্যাপারটা। হাজার হোক জিঞ্জিরের মেয়ে সে। দুই হাতে জড়িয়ে ধরল সে

রানার গলা। সক্রিয়ভাবে সাড়া দিল রানার চুম্বনে, যেন বিভোর হয়ে গেছে।

দশ সেকেণ্ড পার হয়ে গেল, তারপর আরও দশ সেকেণ্ড। তাও দেখা নেই কোনও লোকের। সেই দু'জন টহলদার পুলিসই হবে। ওরা কি এ-আরবিকে-র সেই লোকটার দেহ খুঁজে পেয়েছে? নাকি, এমনিই টহল দিতে দিতে সন্দেহ করেছে যে এই ঘরে লোক আছে? তিরিশ সেকেণ্ড পার হয়ে গেল। এমন সময় জ্বলে উঠল একটা শক্তিশালী টর্চ। একটা উল্লসিত গমগমে কণ্ঠস্বর শোনা গেল টর্চের পেছন থেকে।

'দেখো, দেখো জয়দেব, শয়তানদের কাণ্ড দেখো! টেম্পারেচার টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রী বিলো জিরো, অথচ এদের ভাবটা যেন দিব্যি রোদ পোহাচ্ছে। আজকালকার ছোঁড়া-ছুঁড়িদের হলো কি? অ্যাই ছোকরা,' প্রকাণ্ড এক থাবা বসাল সে রানার কাঁধের ওপর। 'কি করছ তোমরা এখানে? জানো না, আটটার পর থেকে এই এলাকায় কারফিউ?'

'জানি,' শ্রীনগরী উর্দুতে বলল রানা। মুখে ভয় এবং সঙ্কোচের ভাব। কিন্তু মনে মনে খুশি হয়ে উঠল সে। বাস শেলটারের জ্ঞানহীন দেহটা তাহলে এখনও গোপন আছে। 'আমি দুঃখিত। আর কোথাও যাবার জায়গা ছিল না...'

'চোপ, বুদ্ধু কাহিঁকে!' গমগম করে উঠল খোশ মেজাজী গলাটা। 'তোমার বয়সে আমরাও প্রেম করেছি। কিন্তু এমন বোকার মত নয়। কষ্ট করে আর আধ মাইল গেলেই কাফে ডি পার্লের চমৎকার ছোট্ট কেবিন। এই সামান্য বুদ্ধিটুকু নেই মাথায়?'

রানা বুঝল এই লোকের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, বলল, 'আমরা গেছিলাম কাফে ডি পার্লে...'

'কি নাম তোমার? আইডেন্টিটি কার্ড দেখাও। আছে না?' আরেকটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ, সন্দেহপূর্ণ। প্রথম জনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

'কাগজপত্র সঙ্গেই আছে।' পকেটে হাত দিয়ে পিস্তলটা চেপে ধরল রানা। ঠিক এমনি সময়ে প্রথম জন কথা বলে উঠল আবার।

'ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, জয়দেব। তোমার কি মনে হয় পাকিস্তান থেকে ওকে স্পাই হিসেবে পাঠানো হয়েছে শ্রীনগরের তরুণীদের কাছ থেকে কি পরিমাণ সহযোগিতা পাওয়া যায় পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে?' নিজের রসিকতায় নিজেই অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল মোটা লোকটা, তারপর আবার বলল, 'তাছাড়া দেখতে পাচ্ছ না তোমার-আমার মত ও-ও শ্রীনগরের মানুষ? কি বললে? কাফে ডি পার্লে গিয়েছিলে?'

খানিকক্ষণ কি চিন্তা করে বলল, 'উঠে এসো তো দেখি, ছোকরা!'

উঠে দাঁড়াল ওরা দু'জনেই। রানার গালের কাছে টর্চ ধরল লোকটা।

'এই ছোকরাই। আমার আর কোনও সন্দেহ নেই।' মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল মোটা লোকটা। 'এর কথাই বলছিল ওরা। গালের ওপর পাঁচ আঙুলের দাগ দেখছ না? ওর চোয়াল যে খসে যায়নি এই বেশি!' টর্চ ফেলে দেখল সে একবার রুবিনাকে আপাদমস্তক। তারপর তর্জনী তুলে সাবধান করার ভঙ্গিতে বলল, 'সাবধান, ছোকরা! সাবধান করে দিচ্ছি। সুন্দরী, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু রূপ

দেখে ভুলেছ কি মরেছ। এই বয়সেই যদি এই মেজাজ হয়, চল্লিশে পৌঁছলে কি হবে? আমার বিবিকে দেখলে টের পাবে।' হা-হা করে হেসে উঠল সে তার প্রাণ-খোলা হাসি। আবার গমগম করে উঠল ছোট্ট ছাপড়াটা। 'যাও। ভাগো। কেটে পড়ো এখন, বাছারা।'

রাত নয়টা বেজে পাঁচ। জনশূন্য চৌরাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছল ওরা দুজন। এবার দুজন যাবে দুইদিকে।

'আমি বলে-এ দেব!' মাথা দুলিয়ে বলল রুবিনা।

'কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি আমাকে চুমু দিয়েছ।'

'কাকে বলবে?'

'আব্বাকে, ফজল ভাইয়াকে···সবাইকে।'

'রেডিওতে অ্যানাউন্স করে দাও না, বেশি লোক জানবে।'

'দেবই তো!'

'বলো গে, যাও। কেউ আমার দোষ দেবে না। বরং প্রশংসা করবে উপস্থিত বুদ্ধির।'

'প্রশংসা চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল রুবিনা দুষ্টু হাসি হেসে।

'নিশ্চয়ই।'

'তবে আরেকটা চুমু দাও না, আরও প্রশংসা পাবে।'

চোখে চোখে চেয়ে রইল দুজন কয়েক মুহূর্ত।

ক্ষীণ কটি জড়িয়ে ধরল রানার একটা হাত। অনেক কাছে চলে এলো রুবিনা নিঃসঙ্কোচে। দ্বিধা নেই আর তার মনে। ভাল লেগেছে তার এই পাকিস্তানী লোকটাকে!

একরাশ ক্ষুধা নিয়ে হোটেলে ফিরল রানা। ভাল ভাবে পরীক্ষা করে বুঝল, ওর অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢোকেনি কেউ। ঘরটা গরম করবার জন্যে হিটার অন করে দিয়ে খাবারের জন্যে হুকুম করল ম্যানেজারকে। রাত বাজে সোয়া দশটা।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে রানা। নানান কথা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মনের মধ্যে। ঢাকার কথা, রাহাত খান, অফিস, রেহানা; ছবির মত মানসপটে এল—গেল। রাওয়ালপিণ্ডিতে তিনমাস ট্রেনিং-এর কথা মনে এল। ধীরে ধীরে অতীতে চলে গেল মনটা। মনে পড়ল অতীতের অনেক অনেক দিনের স্মৃতি। কত টুকরো পুরানো কথা। সুলতার কথা, মিত্রার কথা, জিনাত, অনিতা, মায়া ওয়াং-এর কথা। জীবনের কত বিচিত্র ঘটনার কথা। প্রবল এক স্রোতের টানে চলেছে সে ভেসে। কোথায় এর শেষ? কোথায়?

গরম ঘরটা ছেড়ে এক্ষুণি আবার বেরোতে হবে, তুষারের মধ্যে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলতে হবে লম্বা রাস্তায়, ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর।

স্যাঁতসেঁতে শার্ট টাই আর মোজা খুলে ভাঁজ করে রাখল সে যত্ন করে। রানা জানে না, জীবনে আর কোনদিন সে ফিরে আসবে না এই ঘরে। নতুন একপ্রস্থ

কাপড় পরে ওভারকোট চাপাল গায়ে, তার ওপর চাপাল রেইনকোট। দরজায় চাবি লাগিয়ে বেরিয়ে এল সে রাস্তায়। সরু করিডরের শেষ প্রান্তে এসে ওর মনে হলো ওর ঘরের টেলিফোনটা বাজছে। তিনবার, চারবার, পাঁচবার—বেজেই চলেছে। গা করল না রানা। ওর ঘরেই যে বাজছে তার কি নিশ্চয়তা। অন্য কোনও ঘরেও তো বাজতে পারে।

জিঞ্জিরের বাড়ির কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যাবার অবস্থা হলো রানার। কিন্তু মনের মধ্যে কোনও উদ্বেগ নেই ওর—একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত, অনুসরণ করছে না কেউ।

গ্যারেজের দরজাটা কথা মত খোলাই আছে। বিনা দ্বিধায় অন্ধকার গ্যারেজে ঢুকে পড়ল রানা। বাম পাশে দেয়ালের গায়ের ছোট্ট দরজাটার দিকে চলল কোণাকুণি। ঠিক চার পা এগোতেই ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠল গ্যারেজের মধ্যে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর উজ্জ্বল আলোতে। দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেল সে খটাং করে লেগে গেল লোহার গেট। থমকে দাঁড়াল রানা।

কয়েকবার চোখ মিটমিট করে আলোটা সইয়ে নিয়ে চারদিকে চাইল সে একবার। দেখল, গ্যারেজের চারকোনে চারজন কালো রেনকোট পরা লোক হাসছে মিটিমিটি। চারজনের হাতের সাব-মেশিনগান আর অটোমেটিক কারবাইনগুলোও যেন মুচকে হাসছে বিদ্রূপের হাসি, ওর বুকের দিকে চেয়ে। এ-আরবিকে! এক নজরেই চেনা যায় ওদের স্পষ্ট। ভুল হবার কথা নয়।

করিডর দিয়ে বেরিয়ে এল পঞ্চম এক ব্যক্তি। পাতলা ছিপছিপে সম্ভ্রান্ত চেহারা। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ। মৃদু হেসে বিদেশী কায়দায় মাথা নত করে অভিবাদন জানাল রানাকে।

'আসুন, আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমরা। পাকিস্তান কাউন্টার ফুলিশনেসের প্রতিভাবান গর্দভ আপনি, কর্নেল গোয়েন্কারাম চাগলার অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

ছয়

একটি কথাও বেরোল না রানার মুখ থেকে। একটুও নড়াচড়া করল না সে। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল গ্যারেজের মাঝখানে। আকস্মিক ধাক্কাটা সামলে নিতেই তার জায়গায় এল তিক্ত একটা উপলব্ধি। ধীরে ধীরে চোয়াল নিচে নেমে মুখটা হাঁ হলো খানিকটা, চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত। পরাজয়ের বিস্বাদ অনুভব করল সে শুকিয়ে আসা কণ্ঠতালুতে।

'মাসুদ রানা!' ফিসফিস করে বলল রানা, 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কর্নেল। কি হয়েছে? বন্দুক কেন? আল্লার কসম খেয়ে বলছি, হুজুর, আমি কোনও অন্যায় করিনি। আপনার পায়ে ধরে···' কান্নায় ভেঙে এল রানার গলা। একজন কাশ্মীরী মুসলমানের যে প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত তাই ফুটিয়ে তুলল রানা ওর চেহারায়, মুখের ভাবে। সাব-মেশিনগান হাতে গার্ডগুলো

একটু হতভম্ব হয়ে এ-ওর দিকে চাইল। কিন্তু কর্নেল গোয়েঙ্কারাম চাগলার উজ্জ্বল চোখে বিন্দুমাত্র সন্দেহের রেখাপাত হলো না।

'স্মৃতিভ্রম,' বলল কর্নেল শান্ত কণ্ঠে। এরকম হয়। হঠাৎ শক্ পেলে অনেকে নিজের নাম, বাপের নাম সব ভুলে যায়। অভিনয়টা চমৎকার হয়েছে। একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, পাকিস্তান তার সেরা গর্দভটাকেই পাঠিয়েছে। অবশ্য প্রফেসার সেলিম খানকে উদ্ধার করবার জন্যে শ্রেষ্ঠ লোক পাঠানোই স্বাভাবিক।'

রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানার মুখ। এই খবর যদি ওরা জেনে থাকে তাহলে সবই জেনেছে। সব আশা, সব ভরসা দপ করে নিভে গেল যেন ওর।

'আমাকে ছেড়ে দিন, হুজুর। আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি এই দেশেরই লোক, শ্রীনগরেই আমার বাড়ি। আমার কার্ড দেখাচ্ছি,হুজুর!' পকেটে হাত ঢুকাল রানা। পিস্তলের বাঁট পর্যন্ত পৌঁছল না হাতটা। তার আগেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গর্জন করে উঠল কর্নেল।

'খবরদার! হাত বের করে আনুন পকেট থেকে!'

বরফের মত জমে গেল রানার শরীর। বুঝল কর্নেলের হাতে ধরা রিভলভারটা দেরি করবে না এক মুহূর্ত। ধীরে ধীরে পকেট থেকে বেরিয়ে এল ওর খালি হাত। বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল কর্নেল চাগলার ঠোঁটে। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে চাইল কর্নেল।

'শম্ভু! মিস্টার মাসুদ রানা এইমাত্র পকেট থেকে পিস্তল বা ওই জাতীয় কোন আপত্তিকর কিছু বের করতে যাচ্ছিলেন। ওঁকে এই প্রলোভন থেকে মুক্ত করো।'

ভারি একটা জুতোর শব্দ শোনা গেল পেছনে, পরমুহূর্তেও আর্তনাদ করে উঠল রানা। ভীষণ জোরে আঘাত করল কেউ ওর শিরদাঁড়ার ওপর রাইফেলের কুঁদো দিয়ে। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল রানা, একটা শক্তিশালী হাত পেছন থেকে কলার চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল ওকে, অন্য হাতটা চালিয়ে দিল পকেটের মধ্যে। প্রথমেই বেরোল রানার সাইলেন্সার ফিট করা অটোমেটিক ডাবল অ্যাকশন ওয়ালথার পি. পি. কে.।

'বাহ্, শ্রীনগরের একজন শান্তিপ্রিয় নিরীহ নাগরিকের কাছে থাকবার মত জিনিসই বটে। নিশ্চয়ই রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছেন ওটা আপনি?' পরমুহূর্তেই গলার স্বরটা পাল্টে গেল চাগলার। 'আরে, এ তো আমাদের জিনিস! কেউ চিনতে পারো, এটা কার?'

অনেক কষ্টে চোখ খুলে চাইল রানা। দেখল, শম্ভুর ছুঁড়ে দেয়া একটা রিভলভার খপ করে শূন্যে ধরে নিয়ে পরীক্ষা করছে কর্নেল। বাস শেলটারের সেই লোকের রিভলভার।

'আমি চিনতে পেরেছি, স্যার,' শম্ভু নামধারী লোকটা কথা বলে উঠল রানার কানের পাশ থেকে। মিকি মাউজের মত কণ্ঠস্বর। ক্যারিক্যাচারের মত হাস্যকর লাগে। রানাকে ছেড়ে দিয়ে কর্নেলের দিকে এগিয়ে গেল শম্ভু। রানা দেখল পাহাড়ের সমান লম্বা লোকটা। ছয় ফুট চারের কম হবে না। তেমনি পাশে। লোমশ হাত দুটো দেখেই বোঝা যাচ্ছে সর্বশরীর ঘন লোমে আবৃত। নাকটা ভাঙা। বিকট চেহারা। চেহারার সঙ্গে গলার স্বরের অদ্ভুত অসামঞ্জস্য। বলল,

'ওটা শান্তারামের। এই যে ওর নামের প্রথম অক্ষর দুটো লেখা। এই রিভলভার কোথায় পেয়েছিস তুই?'

'ওই পিস্তলটার সঙ্গেই। একটা পার্সেলের মধ্যে ছিল। জুবিলি রোডের মোড়ে···'

চোখের নিমেষে শম্ভুর প্রকাণ্ড লোমশ হাতের এক থাবড়া এসে পড়ল রানার মুখের ওপর। মাথা নিচু করবার আর সময় পেল না সে। ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল সে ওপাশের দেয়ালে, ওখান থেকে মাটিতে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে আবার। চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। অনুভব করতে পারল নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে ওর।

'ধীরে, শম্ভু, ধীরে। এত ব্যস্ত হবার কি আছে?' মোলায়েম ভাবে শাসন করল চাগলা শম্ভুকে। 'কিন্তু দোষটা শম্ভুর নয়, মিস্টার মাসুদ রানা। দোষ আপনার। শম্ভুর সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু শান্তারাম এখন হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায়। এখনও বেঁচে আছে কি নেই কে জানে! বাস শেলটারেই অর্ধেক প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল ওর। এই অবস্থায় শম্ভু যদি মাথা ঠিক রাখতে না পারে তবে ওকে বড় একটা দোষ দেয়া যায় না।' দৈত্যটার পিঠে দুটো থাবড়া দিল কর্নেল।

'এই লোকটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, শম্ভু। এর ব্যাপারে সাবধান না হলে বিপদে পড়বে।'

একজন গার্ডকে আদেশ দিল কর্নেল হেডকোয়ার্টারে ফোন করে ভ্যান পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'মিনিট দশেক লাগবে ভ্যান এসে পৌঁছতে। ততক্ষণে আপনার কার্যকলাপের একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তৈরি করে ফেলা যাক। কি বলেন? ভেতরে নিয়ে এসো মি. মাসুদ রানাকে।'

জিঞ্জিরের চেয়ারে গিয়ে বসল গোয়েন্দারাম চাগলা। রানাকে দাঁড় করানো হলো ডেস্কের সামনে। একটা কাগজ আর কলম নিয়ে প্রস্তুত হলো চাগলা।

'আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই আমরা জানি। কাজেই মিথ্যে কথা বলে আমাদের ধোঁকা দেবার বৃথা চেষ্টা করবেন না দয়া করে। আর সবাই সবকিছু স্বীকার করেছে। ওই প্রকাণ্ড চওড়া কাঁধের লোকটা তো কেঁদেই ফেলেছে হাউ-মাউ করে শম্ভুর হাতের এক থাবড়া খেয়ে। ওর কাছ থেকেই বেরিয়েছে সব কথা। আমি কথা দিচ্ছি সব কথা বললে আপনাকে কোনও রকম নির্যাতন করা হবে না। সাধারণ কোর্টে আপনার বিচারের ব্যবস্থা হবে। ন্যায়সঙ্গত এবং উপযুক্ত শাস্তিই হবে আপনার, তার বেশি নয়। কিন্তু যদি শুধু শুধু দেরি করাবার চেষ্টা করেন···' হাসল চাগলা শম্ভুর দিকে চেয়ে।

এত কথা না বললেই ভাল করত চাগলা। কারণ এই কথাগুলো থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা যে জিঞ্জিরের দলের কাউকে ধরতে পারেনি ওরা। বড়জোর খামিসু খানের চেহারাটা এদের কেউ দেখেছে দূর থেকে। খানের পক্ষে সব কথা বলা সম্ভব নয়—আসলে ও জানেই না সব কথা। তাছাড়া শারীরিক নির্যাতনের ভয়ে খামিসু খান এদের কাছে কোনও কিছু স্বীকার করেছে একথা কেন জানি রানার কাছে কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। এরা তো কেউ খানের হাতের চাপ খায়নি। খান ধরা পড়লে ভূমিকম্প হয়ে যেত এই ঘরের মধ্যে—

দেয়ালগুলো একটাও আর খাড়া থাকত না।

'আচ্ছা, শুরু করা যাক। কোন পথে ঢুকলেন এ দেশে? রাস্তা কি তুষারে ঢাকা ছিল?'

'ঢুকলাম এদেশে! রাস্তায় তুষার!' বিস্মিত চোখ মেলে চাইল রানা চাগলার দিকে। 'আমি বুঝতে পারছি, স্যার, আপনাদের কোথাও কোন ভুল হয়ে গেছে। অন্য লোক মনে করে আমাকে ধরে...' হঠাৎ লাফ দিয়ে সরে গেল রানা একপাশে চাগলাকে শম্ভুর দিকে চেয়ে মাথাটা একটু ঝোঁকাতে দেখে। সরে গিয়েই ঘুরে দাঁড়াল সে। প্রচণ্ড জোরে গাঁট্টা চালিয়েছিল শম্ভু রানার মাথা লক্ষ্য করে, ফস্কে যেতেই দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল, এবং রানাও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল এই সুযোগের, ভুল হলো না ওর।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল চাগলা। হাতে পিস্তল। অসহ্য ব্যথায় মাটিতে পড়ে গোঁ-গোঁ করছে আর গড়াগড়ি খাচ্ছে শম্ভু। ডান পায়ের কব্জিতে ব্যথা পেয়েছে রানা, বাম পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। সাব-মেশিনগান হাতে ছুটে আসছে ওর দিকে অপর দু'জন গার্ড। হাত তুলে ওদের থামবার ইঙ্গিত করে মৃদু হাসল কর্নেল চাগলা।

'নিজের মৃত্যুদণ্ড নিজেই ঘোষণা করলেন, মিস্টার মাসুদ রানা। কিন্তু স্পষ্ট বুঝলাম, বোমা মারলেও কথা বেরোবে না আপনার পেট থেকে। এজন্য অন্য ব্যবস্থা আছে আমাদের। আপাতত চলুন হেডকোয়ার্টারে।'

গ্যারেজের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লরি। চারদিক বন্ধ। অনেকটা প্রিজন ভ্যানের মত। সবাই উঠে পড়ল লরিতে। দৈত্যাকার শম্ভুকে কয়েকজন মিলে ধরে তুলল গাড়িতে। ব্যথায় মাঝে মাঝে কুঁচকে যাচ্ছে ওর বিকট মুখ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে ড্রাইভারের ঠিক পেছনে একটা বেঞ্চের ওপর শুয়ে পড়ল সে। গোয়েন্দারাম চাগলা আর দু'জন গার্ড বসল মুখোমুখি ভ্যানের দুই পাশের বেঞ্চে দরজার কাছাকাছি। রানাকে বসানো হলো মেঝের ওপর ড্রাইভারের দিকে পেছন ফিরিয়ে। চতুর্থ গার্ড উঠল ড্রাইভারের পাশে।

প্রথম মোড় ঘুরতেই লাগল ধাক্কাটা। পনেরো সেকেণ্ডও হয়নি রওনা হয়েছে ওরা। প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো কিছুর সাথে। বিশ্রী ধাতব শব্দ। লরির যাত্রীরা ছিটকে পড়ল এ-ওর গায়ে। রানার ঘাড়েও পড়ল এসে একজন।

ব্রেক কষেছিল ড্রাইভার—কিন্তু তাহলে কি হবে, এক মুহূর্ত আগেও সে দেখতে পায়নি, সুযোগ পায়নি প্রস্তুত হবার। চৌরাস্তার মোড়ের ওপর শান বাঁধানো আইল্যাণ্ডের সঙ্গে জোরে আরেকটা ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সবাই, রানাও ভাবছে এই সুযোগে সটকে পড়া যায় কিনা, এমন সময় ঝটাং করে পেছনের দরজাটা খুলে গেল এবং সেই সঙ্গে নিভে গেল গাড়ির ভেতরের লাইট। পর মুহূর্তেই জ্বলে উঠল দুটো শক্তিশালী টর্চ। টর্চের পাশেই দুটো পিস্তলের নল চকচক করছে। একটা কর্কশ গলায় আদেশ এল মাথার ওপর হাত তুলে রাখবার। টর্চ দুটো সরে গেল দু'পাশে এবং হুড়মুড় করে গাড়ির মধ্যে এসে পড়ল চতুর্থ গার্ডটা। তার পেছন পেছন ড্রাইভার। দড়াম করে লেগে গেল পেছনের দরজা। জানালা দিয়ে অকম্পিত হাতে টর্চ আর পিস্তল ধরা।

কয়েক গজ পিছিয়ে এল লরিটা সশব্দে সামনের বাম্পারটা কোনও কিছুর সাথে ভেঙে রেখে। তারপর আবার এগোল সোজা রাস্তা ধরে। সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে। মনে মনে স্বীকার করতেই হলো রানাকে, নিপুণ হাতের কাজ।

এক সেকেণ্ডের জন্যে একটা পোড়া হাতের বীভৎস দাগের ওপর চোখ পড়তেই লাফিয়ে উঠেছিল রানার হৃদয়। এই করিৎকর্মা লোকগুলোর পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ নেই আর। জিঞ্জির। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক ধাক্কা দিয়ে ওর ঘাড়ের ওপর থেকে গার্ডটাকে সরাল রানা। ধাক্কা দিতে গিয়ে টনটন করে উঠল পিঠটা। প্রচণ্ড জোরে মেরেছিল শম্ভু কারবাইনের বাঁট দিয়ে। অবাক হয়ে ভাবল রানা, এতক্ষণ ব্যথাটা ছিল কোথায়? যেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, অমনি অদূর ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর সব নির্যাতনের দুঃসপ্ন ছেড়ে বাস্তবে ফিরে এসেছে সে —চেগিয়ে উঠেছে ব্যথাটা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে একে একে সাব-মেশিনগান আর কারবাইনগুলো তুলল সে বেঞ্চির ওপর। ঠেলে দিল পেছন দিকে। সেখান থেকে একে একে তুলে নিল সেগুলো একটা অদৃশ্য হাত, চলে গেল বাইরের অন্ধকারে। চাগলার পিস্তলও সেই একই ভাবে অদৃশ্য হলো। নিজের পিস্তলটা ওর পকেট থেকে বের করে নিয়ে রাখল রানা কোটের পকেটে। তারপর বসল একটা বেঞ্চির ওপর।

কিছুদূর গিয়ে কমে এল লরির স্পীড। পেছনের পিস্তল দুটো ইঞ্চি কয়েক এগিয়ে এল সামনে। রানাও বের করল পিস্তলটা। পেছন থেকে একটা কর্কশ কণ্ঠ ভেতরের সবাইকে সাবধান করল, যেন টুঁ শব্দটি না করে। চাগলার জুলফির কাছে ঠেসে ধরল রানা ওর সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। গাড়িটা থেমে দাঁড়াতেই কয়েকটা গত বাঁধা প্রশ্ন এবং কর্কশ উত্তর কানে এল। তারপর আবার ছুটল গাড়ি পূর্ণবেগে।

একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হলো এর পরের চেক পোস্টে। তারপর শহর ছেড়ে চলল ওরা গ্রামের দিকে। দুটো টর্চ আর দুটো পিস্তল স্থির হয়ে চেয়ে রইল যাত্রীদের দিকে। প্রত্যেকটা গার্ড অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় কাতর, কেবল গোয়েঙ্কারাম বসে রইল দৃপ্ত ভঙ্গিতে—মুখে ভয়-ভাবনার বিন্দুমাত্র ছায়া নেই। জয় এবং পরাজয়কে একই রকম বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে গ্রহণ করেছে সে।

হঠাৎ মুখে রুমাল চেপে গলার স্বর বিকৃত করে কথা বলে উঠল পেছনের একজন।

'জুতো মোজা খুলে ফেলো সবাই এক-এক করে। বেঞ্চির ওপর সাজিয়ে রাখো।'

সবাই আদেশ পালন করল একে একে। কর্নেল গোয়েঙ্কারাম চাগলাও।

'চমৎকার। এবার ওভারকোটগুলোও দয়া করে খুলতে হবে,' বলল সেই কণ্ঠ। মিনিট তিনেক চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক আছে। এবার শোনো মন দিয়ে। রাস্তার পাশের একটা কুঁড়েঘরে নামিয়ে দেয়া হবে তোমাদের। ওটার তিন মাইলের মধ্যে কোনও লোক বসতি নেই। জুতো মোজা আর ওভারকোট ছাড়া যদি আজই রাতে লোকালয়ে পৌঁছবার চেষ্টা করো তাহলে নির্ঘাত মারা পড়বে। ঘরটায় কাঠ

আছে, আগুন জ্বেলে নিয়ে দিব্বি রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবে। সকালে কোনও না কোনও গরুর গাড়ি বা কপাল ভাল হলে ট্রাক পেয়ে যাবে।'

'এসবের কী অর্থ?' জিজ্ঞেস করল চাগলা।

'অর্থ হচ্ছে এই যে তোমরা কাউকে সাবধান করতে পারছ না। কেউ জানে না আমরা এ-আরবিকে ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। সীমান্ত পর্যন্ত নিরাপদে চলে যাব। তারপর ট্রাকটা খাদের মধ্যে ফেলে সোজা চলে যাব পাকিস্তানে।'

'আমাদের খুন করে রেখে গেলেই কি তোমাদের পক্ষে বেশি নিরাপদ হত না?'

'তা হত, কিন্তু আমরা খুনী নই।'

থেমে গেল ট্রাক। পেছনের দরজা দুটো খুলে গেল ঝটাং করে। একে একে নেমে গেল গার্ডরা। সবশেষে নামল চাগলা। চলে গেল ওরা কুঁড়ে ঘরটার দিকে। রাস্তা থেকে অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরে ঘরটা। এইটুকু যেতেই নিশ্চয়ই ঠাণ্ডায় জমে যাবার জোগাড় হয়েছে ওদের পা। ঘরে ঢুকেই লাগিয়ে দিল দরজা। সাথে সাথেই তিনটি মূর্তি উঠে এল লরির পেছনে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চলতে আরম্ভ করল ট্রাক।

জ্বলে উঠল গাড়ির ভেতরের বাতি। রানার চেহারাটা আর দর্শনযোগ্য নেই মোটেই। 'ইশশ্' বলে উঠল একটা নারীকণ্ঠ। কিন্তু কথা বলল মাহমুদই প্রথম।

'আহা, দেখে মনে হচ্ছে বাসের তলায় পড়েছিলেন, মিস্টার মাসুদ রানা। হয় তাই, নয়তো শম্ভুর সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছেন।'

'আপনি চেনেন ওকে?' কেমন একটা খসখসে শব্দ বেরোল রানার গলা দিয়ে।

'এ-আরবিকে-র প্রত্যেকে চেনে। শ্রীনগরের অর্ধেক লোকই চেনে ওকে হাড়ে হাড়ে। কিন্তু দৈত্যটাকে আজ এত কাহিল দেখলাম কেন?'

'আমি মেরেছি।'

'আপনি মেরেছেন! বলেন কি, সাহেব? আপনি মেরেছেন শম্ভুকে? আপনি দেখছি নমস্য…'

'আহ্, তুমি থামবে, ফজল ভাই?' ধমকে উঠল রুবিনা। 'ওর চেহারাটা দেখেছ? এক্ষুণি কিছু করা দরকার।'

'উমরকে থামতে বলো,' হুকুম করল জিঞ্জির। রানার মুখের দিকে ভাল করে লক্ষ করে বলল, 'তুমি জখম হয়েছ, রানা। মুখটা তো দেখতেই পাচ্ছি, আর কোথায় লেগেছে?'

'পিঠে। রাইফেলের কুঁদো। ঠিক শিরদাঁড়ার ওপর। জায়গাটাতে আর কোনও সাড়া পাচ্ছি না।'

গাড়িটা থামতেই এক লাফে নেমে গেল ফজল মাহমুদ। গার্ডদের খুলে রাখা একটা ওভারকোট পেঁচিয়ে তুষার তুলে আনল সে একগাদা। রানার পাশে নামিয়ে রেখে ইঙ্গিত করল রুবিনাকে। 'মেয়েদের কাজ।'

একটা রুমালে কিছু কিছু করে তুষার তুলে নিয়ে আলতো করে ঘষল রুবিনা রানার রক্ত চটচটে মুখে। কাটা জায়গাগুলোর অসম্ভব জ্বলুনিতে ককিয়ে উঠল রানা। শুয়ে পড়ল সে লম্বা সীটের ওপর।

'কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে গেল কেন? ওরা টের পেল কি করে? কি হয়েছিল?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কি হয়নি তাই জিজ্ঞেস করো,' বলল জিঞ্জির। 'সব গোলমাল হয়ে গেছে। প্রত্যেকে মারাত্মক ভুল করেছে। তুমি, আমি, এ-আরবিকে—সবাই। প্রথম ভুলটা অবশ্য আমরাই করেছি। বাড়ির পাশে যে দু'জন ঘুরঘুর করছিল ওদের দিকে আরও বেশি নজর দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে গেছে যখন তুমি ডক্টর সেলিমের সাথে কথা বলছিলে, সেই সময়টায়।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'ওটা আসলে আমারই দোষ। আমি জানতাম—ওকে সাবধান করতে ভুলে গিয়েছিলাম,' বলল ফজল মাহমুদ এবার।

'কি বলছেন আপনারা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না,' বলল রানা।

'ঘরের মধ্যে মাইক আছে কি না পরীক্ষা করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল মাহমুদ।

'নিশ্চয়ই! ভেন্টিলেটারের ওখানে ছিল।'

'বাথরুম দেখেছিলেন?'

'বাথরুমে ছিল না।'

'ছিল। শাওয়ারের মধ্যে ছিল লুকানো। ফজল বলছে ইম্পিরিয়াল হোটেলের প্রত্যেকটা বাথরুমে শাওয়ারের ভেতর আছে একটা করে মাইক্রোফোন। শাওয়ারটা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করোনি তুমি?' এবার কথা বলল জিঞ্জির।

'শাওয়ার!' উঠে বসল রানা। 'মাইক্রোফোন!' মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল ওর। 'তাহলে যা যা বলেছি···'

থেমে গেল রানা। শুয়ে পড়ল আবার। এতক্ষণে বুঝল সে গোয়েঙ্কারাম তার নাম জানল কি করে, জিঞ্জিরের বাড়ি চিনল কি করে, রানার উদ্দেশ্য সম্পর্কেই বা নিঃসন্দেহ হলো কি করে, উহ্! কি মারাত্মক ভুল সে করেছে! সব শেষ। এর পরে ডক্টর সেলিমকে উদ্ধার করা এখন অসম্ভব। হেরে গেছে রানা। এমন নিষ্ঠুর পরাজয় আর হয়নি কখনও ওর।

'তোমার সাধ্যমত চেষ্টা তো তুমি করেছ, রানা,' কোমল মৃদু কণ্ঠে বলল রুবিনা। 'এজন্যে নিজেকে দোষী ভেবে লাভ তো নেই কিছু, বরং কষ্ট বাড়বে।'

সবাই চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তুষারের ওপর টায়ারের একটানা শব্দ। উঁচু-নিচু জায়গায় পড়লে ঝাঁকিতে দুলছে সবাই। ধীরে ধীরে রানার চিন্তাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। যেন আপন মনে বলছে, এমনি ভাবে কথা বলে উঠল ও।

'ডক্টর সেলিমকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই সরিয়ে নেয়া হয়েছে আরও কড়া পাহারার মধ্যে। হয়তো এতক্ষণে দিল্লীর পথেই রওনা করে দেয়া হয়েছে, কে জানে। ওঁর স্ত্রীকে যে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে সে কথাও বলেছি আমি। ওরা এবার চেষ্টা করবে সেটা ঠেকাতে। সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল । বিচ্ছিরিভাবে হেরে গেছি। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার সান্ত্বনা আছে। আপনাদের কোনও ক্ষতি করিনি আমি। ঠিকানাটা অবশ্য আমার কাছ থেকেই পেয়েছে ওরা—কিন্তু এমনিতেও লোক লেগে গিয়েছিল, আমার সাহায্য ছাড়াই বের করতে পারত ওরা। আপনাদের কারও নাম বা কার্যকলাপ বেরোয়নি আমার মুখ থেকে। কিন্তু কয়েকটা জিনিস বিদঘুটে লাগছে আমার কাছে।'

'কি জিনিস?' প্রশ্ন করেই একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল জিঞ্জির মাহমুদের দিকে।

'প্রথম কথা, হোটেলেই যদি ওরা কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল, তাহলে তখনই ধরেনি কেন আমাকে?'

'তোমার কথাগুলো টেপ-রেকর্ড হয়ে গিয়েছে প্রথম। পরে বাজিয়ে শুনেছে ওরা। ততক্ষণে বেরিয়ে গেছ তুমি হোটেল থেকে।'

'আপনারা আগেই পালিয়ে গেছেন ওই বাড়ি থেকে। আমাকে থামালেন না কেন? আপনারা জানতেন এ-আরবিকে দখল করে নিয়েছে বাড়িটা।'

'ওরা আসবার মাত্র দশ মিনিট আগে আমরা সরে পড়েছি ওখান থেকে। আমরা ফোন করেছিলাম আপনাকে, সাড়া পাইনি কোনও,' এবার উত্তর দিল মাহমুদ।

'আমি একটু আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম হোটেল থেকে। অনেক পথ ঘুরে যখন স্থির নিশ্চিত হলাম যে কোনও লোক অনুসরণ করছে না, তখন ঢুকেছিলাম ওই বাড়িতে।' রানার মনে পড়ল হোটেল থেকে বেরোবার সময় টেলিফোন রিং-এর কথা। 'কিন্তু রাস্তাতেও তো আমাকে তুলে নিতে পারতেন আপনারা—কিংবা সাবধান করে দিতে পারতেন।'

'পারতাম। ফজল, সব কথা খুলেই বলো,' উত্তর দিল জিঞ্জির।

'বলছি।' একটু সময় লাগল মাহমুদের সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে। তারপর ঝেড়ে ফেলল সমস্ত দ্বিধা। 'কর্নেল গোয়েঙ্কারাম চাগলা হচ্ছে এ-আরবিকে-র অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি ভয়ঙ্কর। এত ধুরন্ধর লোক সারা আর্মি ইন্টেলিজেন্সে দ্বিতীয়জন আছে কিনা আমার সন্দেহ। কেবল ধূর্ত নয়, এই লোক প্রতিভাবান এবং করিৎকর্মা। এই একটি মাত্র লোককে আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখি। নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন—ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও একবারও ওর চোখের সামনে আসিনি আমি। ধরা পড়বার ভয়ে। জিঞ্জিরও…'

'আসল কথায় আসুন, মিস্টার মাহমুদ,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রানা। বলবার আগেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ফেলে তিক্ত হয়ে গেছে ওর মনটা। তাকে তাহলে ঈর্ষা করতে শুরু করেছে মাহমুদ!

'এসে গেছি। এই লোকটি ইদানীং আমার প্রতি একটু সদয় ব্যবহার করছেন। আমার সন্দেহের কথা আপনাকে আগেই বলেছি, মি. রানা। সন্দেহের জোরেই বেঁচে আছি আমরা। কেন যেন মনে হলো পুলিস ব্লক থেকে প্রায়ই আমার বন্দী ছুটিয়ে আনাটা হয়তো কোনও সূত্রে জানতে পেরেছে চাগলা এবং একটা গল্প বানিয়ে আপনাকে নিয়োগ করেছে আমাকে ধরবার জন্যে।' মৃদু হাসল মাহমুদ। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে রুবিনার মুখ। 'পাকিস্তানী স্পাই, ডক্টর সেলিমকে উদ্ধার, সব কিছু হয়তো সাজানো, আপনি হয়তো গোয়েঙ্কারাম চাগলারই দাবার গুটি। আমরা জানি না, অথচ ঢাকায় বসে রাহাত খান জানেন ডক্টর সেলিমের শ্রীনগরে আসবার কথা, এটাও আপনার বিরুদ্ধে সন্দেহের একটা কারণ। তারপর আপনি আজ সন্ধ্যায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন রুবিনার কাছে জিঞ্জিরের কথা, আমার কথা। এবং পুলিসের লোকগুলো হুড়োহুড়ির মধ্যে প্রেমিক জুটিকে যে ছেড়ে দিল এর

অন্য কারণও থাকতে পারত।' এবার আরও স্পষ্ট টের পেল রানা মাহমুদের ঈর্ষা। কিন্তু মুখের ভাবে প্রকাশ করল না।

'আমাকে তো এসব কথা বলনি?' রুবিনার মুখটা রাগে-দুঃখে লাল হয়ে গেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল সে।

'তোমাকে আমরা সব সময় জীবনের কর্কশ দিকটা থেকে আড়ালে রাখবার চেষ্টা করি।...তার ওপর, মিস্টার রানা, যখন আমাদের টেলিফোনের কোনও উত্তর এল না, তখন ভাবলাম কে জানে, হয়তো এ-আরবিকে হেডকোয়ার্টারে আমাদের জন্যে অধীর ভাবে অপেক্ষা করছেন আপনি। আমাদের সন্দেহ আরও একটু জোরদার হলো। তাই ওই মাকড়সার জালে ঢুকবার সময় বাধা দিইনি আমরা আপনাকে। সত্যি বলতে কি আমরা সারাটা পথ অনুসরণ করেছি আপনাকে। আপনি লক্ষ করেননি, কিন্তু এ রাস্তায়, ও রাস্তায়, এ বাড়ি ও বাড়ির সামনে, পার্ক করা একটা গাড়িকেই কয়েকবার দেখেছেন আপনি। আমি আর উমর নিচু হয়ে বসেছিলাম সেই গাড়ির মধ্যে। অন্ততঃপক্ষে ছয় সাতবার আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেছেন আপনি। ওই গাড়িটা দিয়েই উমর গুঁতো মেরেছিল এই ভ্যানকে। কিন্তু ওরা যে এত তাড়াতাড়িই মারপিট আরম্ভ করবে ভাবতেও পারিনি।' রানার চোখের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল মাহমুদ।

'আপনাদের সন্দেহ নিরসন হয়েছে আশা করি?' মৃদু হেসে বলল রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারল সে তীক্ষ্ণধী মাহমুদ ঈর্ষান্বিত হয়ে ওর ওপর নিষ্ঠুর প্যাঁচ কষেছে একটা। সে যা বুঝিয়েছে জিঞ্জির তাই বুঝেছে। ইচ্ছে করলেই রানা এই মুহূর্তে সবাইকে বুঝিয়ে দিতে পারে মাহমুদের প্যাঁচ-ঘোঁচ। কিন্তু কেন জানি মায়া হলো লোকটার প্রতি। বেচারা আর দু'মাস বাঁচবে। মনে মনে ক্ষমা করে দিল সে মাহমুদের অক্ষম ঈর্ষা। ওকে লক্ষ করছিল মাহমুদ, চোখ তুলতেই চট করে অন্যদিকে চাইল।

কিন্তু লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে, দুঃখে কেঁদে ফেলল রুবিনা। এই নিষ্ঠুরতা বড় বেশি করে বাজল ওর বুকে। রানার মাথার কাছে বসে ছিল সে। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল রানার কপালে। নিজেকে ধন্য মনে করল রানা।

আঘাত খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে জিঞ্জির। তাছাড়া ভেতরের ব্যাপার কিছুই বুঝল না সে। কোনও পরিবর্তন হলো না ওর মুখের ভাবে। বলল, 'এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে আমরা দুঃখিত। কিন্তু যেখানে পাঁচজনের জীবন মরণের প্রশ্ন এবং এই পাঁচজনের ওপর নির্ভর করছে আরও হাজার হাজার কাশ্মীরী মুসলমানদের জীবন, সেখানে কোনও রিস্ক নেয়াটা আমাদের পক্ষে শুধু অন্যায় নয়, গুরুতর অপরাধ হত। যাক সব তো ফেঁসে গেল, এখন কি করবে, রানা? সোজা বর্ডার?'

'বর্ডার তো নিশ্চয়ই। কিন্তু ডক্টর সেলিমকে ছাড়া নয়।'

স্তব্ধ হয়ে গেল গাড়ির মধ্যেকার সবাই। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল রানার মুখের দিকে। এক মিনিট কেটে গেল চুপচাপ। বলে কি লোকটা? মানুষ না কি?

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার! নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে মাথা!' ফিসফিস করে বলল রুবিনা।

'কোনও সন্দেহ নেই তাতে,' বলল ফজল মাহমুদ। নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। সব কথা ফাঁস করে দিল না বলে কৃতজ্ঞ সে রানার কাছে।

'পাগলামি,' হাসল জিঞ্জির। 'কিন্তু এর চেয়ে ছোঁয়াচে রোগ আর নেই। আমার ভয় হচ্ছে, আমিও আক্রান্ত হয়ে পড়ছি।'

'আমিও,' বলল মাহমুদ।

অবাক চোখে দেখল রুবিনা তিনটি নির্ভীক দুর্ধর্ষ পুরুষকে। পরাজয় কাকে বলে জানে না এরা।

সাত

ঘুম ভাঙল রানার ভোর ছ'টায়। ছোট্ট একটা ঘরে শুয়ে আছে সে। রাত প্রায়দুটোর সময় পৌঁছেচে ওরা এখানে এসে। রাস্তা থেকে মাইল খানেক পায়ে হেঁটে এই পল্লী। জিঞ্জিরের গোপন আস্তানা। তুষার পড়া থেমেছিল কিছুক্ষণের জন্যে, এখন আবার আরম্ভ হয়েছে। শুয়ে শুয়ে কাঁচের জানালা দিয়ে ভোরের পূর্বাভাস দেখছে রানা। পিঠের জ্বলুনিটা নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে সবটা পিঠ ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠছে—সেই সাথে কাঁটা ফোটানোর মত খচখচে ব্যথা। যতটা সম্ভব নড়াচড়া না করে পাশ ফিরল সে। ঘুম পুরো হয়নি—বিস্বাদ হয়ে আছে মুখ।

গতকাল রাতেই মাহমুদ আর উমর ফিরে গেছে শ্রীনগরে। ট্রাকটাকে শহরের মধ্যেই কোথাও ফেলে রাখতে হবে। কাছাকাছি কোথাও রাখলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া মাহমুদের ফিরে যাওয়াটা একান্তই দরকার। এটুকু অন্তত নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ওর ওপর কোন সন্দেহ আসেনি চাগলার। ডক্টর সেলিমকে হোটেল থেকে সরিয়ে কোথায় রাখা হয়েছে সেটা জানার চেষ্টা করবে সে আজ অফিসে ডিউটিতে গিয়ে। এ খবর জানবার আর কোনও রাস্তা নেই এছাড়া।

নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে দেখল রানা, দশগুণ বর্ধিত প্রহরার মধ্যে থেকে ডক্টর সেলিমকে উদ্ধার করা সত্যিই এখন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সাবধান হয়ে গেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। সূঁই ঢুকাবার রাস্তাও রাখবে না ওরা। হয়তো জেলখানাতেই রেখেছে, কে জানে! আগামীকালই আরম্ভ হচ্ছে কনফারেন্স। ওঁকে কি অংশগ্রহণ করতে দেবে এত কাণ্ডের পরও? সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক এবং সেই সাথে সাংবাদিকরা আসবে। বেফাঁস কথা যদি বলে বসেন, এই ভয়ে হয়তো সরিয়ে ফেলবে ওরা ওঁকে।

তাছাড়া ওঁর স্ত্রীরই বা কি খবর কে জানে। যে ভুল করে বসেছে ও, তার ফলে ওঁকে নিয়ে ওরা এদেশ থেকে বেরোতে পারবে বলে তো মনে হয় না। টেপরেকর্ডারে ওঁর ব্যাপারে জানতে পেরে নিশ্চয়ই হন্যে হয়ে খুঁজছে এখন ওরা ডক্টর সেলিমের স্ত্রীকে। হয়তো এতক্ষণে ধরেই ফেলেছে।

যদি ওঁর স্ত্রী বর্ডার পার হবার আগেই ধরা পড়েন, তাহলে খালি হাতে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই রানার। কিন্তু আজ রাতে

যদি সিগন্যাল পাওয়া যায়, তাহলে যে করে হোক বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে উদ্ধার করতেই হবে।

চিন্তাটা ওখানেই বন্ধ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে।

বেলা দশটায় আবার ঘুম ভাঙল রানার। প্রায় সাথে সাথেই ঘরে ঢুকল রুবিনা নাস্তা নিয়ে। বলল, 'জলদি খেয়ে নাও, এক্ষুণি ডাক্তার এসে যাবে।'

অনেক কষ্টে বিছানা ছেড়ে উঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এল রানা। পিঠটা গত রাতেই একবার পরীক্ষা করে দেখেছে রুবিনা, আজ আবার দেখে আঁৎকে উঠল। লাল, নীল, বেগুনী, কালচে—রংধনুর সব রঙই নাকি দেখা যাচ্ছে পিঠের ওপর।

নাস্তা শেষ হতেই জিঞ্জিরের সাথে ঢুকল ডাক্তার। প্রকাণ্ড চেহারা, কিন্তু দেহের উপর আর নিচের ভাগে কোনও সামঞ্জস্য নেই। কেমন যেন বেধড়ক কিসিমের। থ্যাবড়া নাকের মস্ত একজোড়া বাটার জুতো—বোধহয় ব্রিটিশ আমলে কেনা। ডাক্তারসুলভ অভয় দানে অভ্যস্ত আত্মবিশ্বাসী অমায়িক কণ্ঠস্বর, যেটা শুনলেই রোগীর অন্তরাত্মা শুকিয়ে আসে; ভাবে, নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক কিছু হয়েছে, নইলে এই ব্যাটা 'কিছু হয়নি, কিছু হয়নি' করছে কেন। কানে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে পরীক্ষা করল রানাকে ডাক্তার কিছুক্ষণ, পিঠটা দেখল। তারপর ঘোষণা করল, 'ভয় নেই, আপনি বাঁচবেন। সামান্য ইন্টারন্যাল হেমোরেজ। তবে খানিক ব্যথা সহ্য করতে হবে। ব্যথার চোটে আপনার মনে হবে ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু দেখবেন কালই সেরে গেছেন অর্ধেকের বেশি। একটা রুমাল দাও দেখি, জিঞ্জির।'

জিঞ্জিরের দেয়া একটা রুমালের ওপর অনেকখানি মলম লাগাল ডাক্তার যত্নের সাথে। বলল, 'দেশীয় গাছগাছড়া থেকে তৈরি ওষুধ। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে জিনিসটা। সবখানেই ব্যবহার করি এটাকে আমি, প্রায় সব রোগেই। এ ধরনের ওষুধে সাধারণ লোকের খুব বিশ্বাস—যে ডাক্তার দেশী ওষুধ ব্যবহার করে তার ওপর লোকের ভক্তি এসে যায়। তাছাড়া মেডিক্যাল সাইন্সের নিত্য নতুন আবিষ্কারের খবর রাখার ঝামেলা থেকেও বেঁচে যাই। ততক্ষণে রুমালটা বসিয়ে দিয়েছে ডাক্তার রানার পিঠের ওপর। প্রায় সাথে সাথেই জ্বলুনি আরম্ভ হয়ে গেল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে পড়ে থাকল রানা। ঘাম দেখা দিল কপালে। ওর অবস্থা দেখে খুব খুশি হয়ে উঠল ডাক্তার।

'কিছু চিন্তা নেই—কালকেই ইচ্ছে করলে হাডুডু খেলতে পারবেন। এই সাদা ট্যাবলেট দুটো গিলে ফেলুন তো? হ্যাঁ, এই তো। ভেতর থেকে ব্যথাটা কমিয়ে দেবে। আর এবার এই নীল ট্যাবলেট। দশ মিনিটের মধ্যে ঘুম না এলে টান দিয়ে ফেলে দেবেন এই পুল্টিশ। ঘুম আসবে না মানে? আসতেই হবে। কড়া ঘুমের ওষুধ।'

এগারো ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙল রানার রুবিনার ঝাঁকুনিতে।

'কেবল যে ঘুমিয়েই চলেছ, ঘুমিয়েই চলেছ, খেতে-টেতে হবে না কিছু?'

ঘড়ি দেখল রানা। দেখেই লাফিয়ে উঠে বসল। পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে গেল পিঠে একটুও ব্যথা লাগল না বলে। কিন্তু অবাক পরে হওয়া যাবে, দশটা বাজছে। রাত দশটা।

রানাকে উঠে বসতে দেখেই ট্র্যানজিস্টার খুলে করাচী ধরল রুবিনা। নাহ্। কোনও সংবাদ নেই রানার জন্যে। আবার শুয়ে পড়ল সে বিছানায়। এবারও ব্যথা লাগল না একটুও।

'কেমন বোধ করছ এখন?' জিজ্ঞেস করল রুবিনা।

'তাজ্জব কাণ্ড, রুবিনা! একফোঁটা ব্যথা নেই।'

'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? ডাক্তার চাচা তো বলেইছিলেন।'

'কেবল ডাক্তার বললেই যদি ব্যথা সারত! কিন্তু আশ্চর্য, একজন গ্রাম্য ডাক্তার...'

'গ্রাম্য ডাক্তার? ওহ্-হো, তুমি বোধহয় জানো না। উনিই কাশ্মীরের একমাত্র এফ.আর.সি.এস.। মাথায় ছিট আছে। বিলেত থেকে ফিরে গ্রামে এসে চিকিৎসা করছেন—দেশের উপকার আর কি। যাক, আসল কথায় আসা যাক, খবরটা আসেনি, তাই না?' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল রুবিনা।

'না। খুব সম্ভব ধরা পড়েছে ওরা।'

রানা লক্ষ করল যেন একটা কালো মেঘ সরে গেল রুবিনার মুখের ওপর থেকে। মনে-প্রাণে সে চাইছে যেন ধরা পড়েন ডক্টর সেলিমের স্ত্রী। নইলে কি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে যে ঝাঁপিয়ে পড়বে এরা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে ওর। বলল, 'এমনও তো হতে পারে, টের পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে ওরা, সুযোগ মত পার হবে বর্ডার?'

'সম্ভাবনা কম। তবু আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

রানার খাওয়া হয়ে গেলে এঁটো থালা নিয়ে চলে গেল রুবিনা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে বাড়ির। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল সে গ্লাসটা ফেলে গেছে এই ছুতোয়। কথায় কথায় রাত হয়ে গেল অনেক। কিন্তু যে কথাটা বলতে এসেছিল সেটাই বলা হলো না।

পরদিন সকালে ফিরে এল উমর খবর নিয়ে।

ডক্টর সেলিমকে হোটেল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কোথায় রাখা হয়েছে জানা যায়নি এখনও। গুজব ছড়ানো শুরু হয়ে গেছে যে ডক্টর সেলিম অসুস্থ—হয়তো কনফারেন্সে যোগদান করতে পারবেন না। ওঁকে হয় দিল্লীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, নয়তো কোনও গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এ-আরবিকে হেডকোয়ার্টারে নেই। মাহমুদের ধারণা, ডক্টর সেলিমের স্ত্রী যদি বর্ডার পার হবার আগেই ধরা পড়ে গিয়ে থাকেন তাহলে হয়তো তাঁকে কনফারেন্সে যোগদান করতে দেয়া হবে; কিন্তু উনি ফস্কে গিয়ে থাকলে সোজা দিল্লী পাঠিয়ে দেয়া হবে। বর্ডারের এত কাছে শ্রীনগরে রাখবার ঝুঁকি নেবে না। আর সর্বশেষ সংবাদ—আবার রক্ত পড়তে আরম্ভ করেছে মাহমুদের নাক-মুখ থেকে। কথাটা মাহমুদ বলেনি, উমর নিজ চোখে দেখে এসেছে।

সারাটা দিন ছটফট করে কাটাল রানা। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত পায়চারি করে বেড়াল সারা বাড়ি অস্থির পায়ে। কিছুতেই সময় কাটতে চাইছে না। বিকেলের দিকে একটা সাইলেন্সার পাইপ খুলে রাখা টু হানড্রেড সি. সি. ট্রায়াম্প মোটরসাইকেলে দুনিয়া কাঁপিয়ে চলে গেল উমর শ্রীনগরে। কাউবয় পোশাক আর

উদ্ধত যৌবনই ওকে সন্দেহমুক্ত রেখেছে এতদিন। মাহমুদের সাথে দেখা করে দশটা এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসবে সে।

'চলো রানা, তোমাকে লেক দেখিয়ে আনি।'

বিকেলে রুবিনা এসে ডাকল রানাকে। ঘণ্টা দু'য়েক হলো আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গিয়ে তুষার ঝরা বন্ধ হয়েছে। বেরিয়ে পড়ল ওরা দু'জনে।

'কারও চোখে পড়বার ভয় নেই তো?'

'নাহ্। আশেপাশে দু'মাইলের মধ্যে একটি প্রাণীও খুঁজে পাবে না তুমি।'

সামনের জঙ্গলটা পার হলেই লেক। উলার লেক। মস্ত উঁচু একটা পাহাড়ের পায়ের কাছ থেকেই যেন শুরু হয়েছে লেকটা। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহানের নিজ হাতে লাগানো গাছ দেখাল রুবিনা। প্রাসাদও ছিল একটা। কিন্তু এই সাড়ে তিন শতাব্দীতেই ডুবে গেছে সেটা মাটির তলায়— কেবল ছাদটা দেখা যাচ্ছে।

'জানো, এই লেকটা সম্পর্কে একটা কিংবদন্তী আছে। হাজার হাজার বছর আগে নাকি একটা নগরী ছিল এখানে। খুবই সমৃদ্ধ নগরী, কিন্তু নানা রকম পাপ আর ব্যভিচারে মত্ত হয়ে পড়েছিল সবাই। তাই দেবতারা নাকি অসন্তুষ্ট হয়ে শাপ দিলেন এই নগরীকে। সাথে সাথেই প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প হলো এবং পুরোটা নগরী তলিয়ে গেল মাটির নিচে। সেটাই এখন উলার লেক। পাপ তলিয়ে গিয়ে স্বচ্ছ পবিত্র পানি উঠে এল তার জায়গায়, কিন্তু এখনও নাকি মাঝে মাঝে সেই দুষ্ট লোকদের প্রেতাত্মা উঠে আসে ওপরে—কাছে কিনারে কাউকে পেলে ধরে নিয়ে যায় পানির তলায়।'

রানাকে হাসতে দেখে বলল, 'ভূত-প্রেত অবশ্য আমিও বিশ্বাস করি না, কিন্তু নগরী তলিয়ে যাওয়াটা আমার বিশ্বাস হয়। সেজন্যেই তোমাকে নূরজাহানের বাড়িটা আগে দেখিয়ে আনলাম। মাত্র সাড়ে তিন শতাব্দীতেই কি অবস্থা হয়েছে তা তো নিজের চোখেই দেখলে। ভূ-তত্ত্ববিদের হিসেবে বলে খৃস্টপূর্ব ২০০০ সালে মস্ত ভূমিকম্প হয়েছিল এই এলাকায়। সেই সময় কোনও নগরী ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়ে উলার লেক তৈরি হয়ে থাকতেও পারে। কিংবদন্তীর পেছনেও কিছু কিছু সত্যতা থাকে।'

লেকের পারে দাঁড়িয়ে গোধূলির আকাশ দেখল দু'জন। অনেক নিচে নেমে গেছে পানি। গ্রীষ্মকালে ভরে যাবে কানায় কানায়। মৃদু বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠে ঝিলমিল করছে লেকের জল। পেছনে মস্ত উঁচু পাহাড়ের গায়ে পাইন আর উইলো গাছগুলো পরেছে তুষারের চাদর। সামনে অথৈ জলের বিস্তার। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা পাল তোলা নৌকা। রুবিনা বলল, 'ওই জায়গাটাকে 'মোটাখাম' বলে। ঝিলাম নদী ওখানে লেকের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। বছর-বছর লোক মারা যায় বলে জায়গাটার নাম মোটাখাম। এই জায়গায় এসে মাঝিরা পানিতে পয়সা ফেলে দেবতার কাছে নিরাপত্তা ভিক্ষা করে।

পশ্চিম আকাশে গোধূলির লাল। অনর্গল গল্প করছে রুবিনা। লাল রঙ এসে পড়েছে রুবিনার গালে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে রানার। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে রানা ওর

চিবুকের তিল, জুলফির উড়ু উড়ু চুল। হেসে ফেলল রুবিনা।

'কি? তুমি কথা শুনছ, না আমাকে দেখছ?'

'দুটোই।'

হঠাৎ রানার হাত ধরল রুবিনা। বলে ফেলল যে কথাটা কাল থেকে বলি বলি করেও বলা হয়নি।

'আজ যদি সিগন্যাল আসে, সত্যিই তুমি যাবে ওই বিপদের মধ্যে?'

'যাব।'

'আমি যদি কোনও অনুরোধ করি সেটা রাখবে না তুমি?'

'আমি যদি কোনও অনুরোধ করি, তুমি রাখবে?'

চমকে চাইল রুবিনা রানার চোখে। সত্যিই তো! এ কথা তো সে ভাবেনি একটিবারও। রানাকে ও বিপদের মধ্যে যেতে দিতে চায় না, জানে, এখন সেলিম খানকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করা আত্মহত্যারই সামিল, যে করে হোক ও চাইছে এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রানাকে রক্ষা করতে। কিন্তু কেন? যে ভালবাসার জোরে সে রানাকে অনুরোধ করবে, সেই ভালবাসার জোরেই যদি রানা তাকে সাথে নিয়ে পাকিস্তানে ফিরতে চায়, সে কি পারবে যেতে? আব্বাকে ছেড়ে, নিজের পবিত্র দায়িত্ব ছেড়ে? পারবে না। তার দেশের প্রতি কর্তব্য তাকে করতেই হবে। তবে সে-ই বা কেন রানাকে তার কর্তব্য পালনে বাধা দেবে?

'তুমি ভয়ঙ্কর লোক, রানা!'

'কেন?'

'এক কথায় আমাকে চুপ করিয়ে দিলে।'

'দেখো, রুবিনা, তুমি আমি দু'জনেই পরিস্থিতির দাস। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছেমত চলতে পারি না। আমরা চেষ্টা করলেও নিজের অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাতে পারব না। এখন ভাবছি, কোনওদিন তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলেই বোধহয় ভাল হত।'

বড় করুণ শোনাল রানার কথাগুলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। ছোট ছোট ঢেউগুলো কালচে হয়ে আসছে সন্ধ্যার পরশ পেয়ে। মেঘের গায়ের লাল রঙ আবছা হয়ে আসছে। বাড়ি ফিরতে হবে।

'একটি ঘোষণা। যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন আজ রাত নয়টা পাঁচ থেকে নয়টা সাত পর্যন্ত এই দুই মিনিট শর্টওয়েভে আমাদের অনুষ্ঠান প্রচার করা সম্ভব হয়নি। এজন্যে আমরা দুঃখিত।'

খবরটা শুনে রানা, জিঞ্জির, খান আর রুবিনার মত চমকে উঠল শ্রীনগরের অন্তত একশোটা রেডিওর সামনে বসা দুইশো জন শ্রোতা। লাফিয়ে উঠল রানার বুকের মধ্যে এক ঝলক রক্ত। রুবিনার দিকে ফিরে দেখল, কালো হয়ে গেছে ওর মুখ। পাকিস্তানে পৌঁছে গেছেন ডক্টর সেলিমের স্ত্রী। কথাটা রানারা যেমন জানে, তেমনি জানে এ-আরবিকে এবং পুলিসের কর্মকর্তারা। সবাই জানে এ ঘোষণার তাৎপর্য। এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেবে ডক্টর সেলিমের প্রহরার।

এমনি সময় দড়াম করে দুপাট দরজা খুলে ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে বীর

দর্পে ঘরে প্রবেশ করল শ্রীমান উমর। সুসংবাদ দুঃসংবাদ দুটোই আছে। সুসংবাদ হচ্ছে, ডক্টর সেলিমকে কোথায় রাখা হয়েছে অতি সহজেই জানতে পেরেছে মাহমুদ। এ-আরবিকে-র চীফ মোহন সিং নিজ-মুখে বলেছেন মাহমুদকে কথায় কথায়। আর দুঃসংবাদ হচ্ছে, ডক্টর সেলিমকে রাখা হয়েছে কাশ্মীরের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য কারাগারে। শ্রীনগর থেকে পঁচিশ মাইল দক্ষিণে নাগাবল জেলখানায়। ওখান থেকে আজ পর্যন্ত একটি বন্দীও পালিয়ে যেতে পারেনি।

মাহমুদকে কর্নেল গোয়েঙ্কারাম চাগলা একটা বিশেষ কাজে শহর থেকে বাইরে পাঠাচ্ছে বলে সে নিজে কোনও সাহায্য করতে পারবে না ওদের। কিন্তু সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছে সে। একটা মস্ত ঠগবাজির ব্যবস্থা করেছে সে কৌশলে। রানা এবং জিঞ্জিরের জন্যে এ-আরবিকে আইডেন্টিটি কার্ড জোগাড় করে পাঠিয়েছে সে—সেই সাথে এক জোড়া এ-আরবিকে ড্রেস। কিন্তু তার চেয়েও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হচ্ছে এ-আরবিকে চীফের চিঠি। মোহন সিং ও একজন মিনিস্টারের সই আছে, সীল আছে। জাল বলে ধরবার কোনও উপায় নেই। নাগাবলের সিকিউরিটি প্রিজ্‌নের জেলারের কাছে লেখা। চিঠি পাওয়া মাত্রই যেন প্রফেসর সেলিম খানকে পত্র বাহকদের হাতে তুলে দেয়া হয়। এই চিঠিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। চিঠির কাগজটা পর্যন্ত অশোক স্তম্ভের জলছাপ দেয়া। তাছাড়া মোহন সিং ও ক্যাবিনেট মিনিস্টারের সইকে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা নেই জেলারের।

খামিসু খান আর উমরকে সঙ্গে নেবার পরামর্শ দিয়েছে মাহমুদ। জেলখানার মাইল পাঁচেক দূরে টেলিফোন পোলের কাছে রয়ে যাবে ওরা। তাহলে দলের সবাই যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে পরস্পরের সঙ্গে।

এবং অবশেষে নাগাবল যাবার জন্যে একখানা গাড়ি যোগাড় করে দিয়েছে মাহমুদ। কোত্থেকে যোগাড় করেছে বলেনি। গাড়ির কথা শুনেই রানার মনে পড়ল উমরের সাইলেন্সার পাইপ খুলে রাখা মোটর সাইকেলের দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজ পায়নি বলেই হঠাৎ দরজা খোলায় চমকে উঠেছিল সবাই। গাড়ি নিয়ে এসেছে উমর।

আরও দুঃসংবাদ: মাহমুদের অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম আরও বেড়েছে। নাকমুখ দিয়ে থেকে থেকে ভয়ঙ্কর রক্তস্রাব হচ্ছে। উমরের ধারণা এই ধাক্কাতেই শেষ হয়ে যাবে মাহমুদ। ডাক্তারও তাই বলেছিল। আর একটা বা দুটো স্ট্রোক সহ্য করতে পারবে সে—তার বেশি নয়।

'আশ্চর্য!' বলল রানা। 'লোকটা মানুষ না কী! একদিনে এতকিছু ব্যবস্থা করল কি করে? তাজ্জব কারবার!'

'এই চিঠি নিয়ে তোমরা তাহলে ঢুকছ নাগাবল জেলখানায়?' জিজ্ঞেস করল রুবিনা গম্ভীর মুখে।

'হ্যাঁ, ঢুকছি,' বলল জিঞ্জির। 'এই শেষ চেষ্টা আমাদের। ভেবে দেখো একজন বৃদ্ধ লোকের কথা; স্ত্রী, পুত্র চলে গেল পাকিস্তানে, শত্রুদেশে একা পড়ে রইল সে অসহায় অবস্থায় আত্মীয়স্বজন থেকে কত দূরে। জেলখানায় জেলখানায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে তাঁকে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মুখে। এই অন্যায় কি মানুষ হয়ে সহ্য করে নেব আমরা? আমাদের কিছুই করবার নেই একজন অসহায় বৃদ্ধের জন্যে? আমাদের

ঢুকতেই হবে ওখানে।'

বোবা ব্যথায় ভরে গেল রুবিনার চোখ। এই সব কথায় কি মেয়েমানুষের মন দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারে? নাগাবলের কথায় সত্যিই ভয় পেয়েছে সে—এই অনিশ্চয়তার মধ্যে পুরো একটা দিন কাটাবে কি করে সে? ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল সে ঘর ছেড়ে।

পরদিন ঠিক সাড়ে এগারোটায় পৌঁছল ওরা নাগাবল জেলখানার সামনে। জেলখানার উঁচু দেয়ালের ওপর কয়েকটা তার দেখে বোঝা গেল কেন আজ পর্যন্ত কেউ পালাতে পারেনি এখান থেকে। কমপক্ষে দশ হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি আছে ওই তারে।

জোরে ব্রেক কষে থামল গাড়ি জেল গেটের কাছে। ছুটে এল গাড়ির কাছে একজন প্রহরী আইডেন্টিটি কার্ড দেখবার জন্যে। এ-আরবিকে পোশাকে ওদের নামতে দেখে থমকে দাঁড়াল সে। কঠোর চাহনি দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল রানা প্রহরীর সব উৎসাহ। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'জেলারকে ডেকে আনো।'

অফিস কামরায় ওদের বসিয়ে খবর দেয়া হলো জেলারকে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল জেলার। একবিন্দু সন্দেহ করল না ওদের। কফির অর্ডার দিতে চাইল—ওরা অবজ্ঞার সাথে নিষেধ করায় বিনীত হাসল। জিঞ্জিরের হাত থেকে নিল সে সীলমোহর করা চিঠিটা। মনোযোগ দিয়ে পড়ল।

'আমি জানতাম আপনারা আসবেন। জেনারেল মোহন সিং আমাকে আগেই বলেছিলেন যে কি একটা সংবাদ না পেলে ডক্টর সেলিম খানকে নেবার জন্যে লোক পাঠাবেন। খবরটা তাহলে পাওয়া যায়নি, তাই না?'

ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছিল রানার কথা শুরু করবার ধরন দেখে। সামলে নিয়ে বলল, 'সে-সব আমরা জানি না। বন্দীকে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে আমাদের ওপর। ব্যস।'

'আপনাদের আইডেন্টিটি কার্ড, কাগজপত্র সঙ্গেই আছে তো?' জিজ্ঞেস করল জেলার যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে।

'নিশ্চয়ই।'

ওদের পরিচয়পত্রগুলোও পরীক্ষা করল জেলার মন দিয়ে, তারপর টেলিফোনটা দেখিয়ে বলল, 'আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এ-আরবিকে হেডকোয়ার্টারের সাথে আমাদের ডাইরেক্ট টেলিফোন যোগাযোগ আছে। সেলিম খানের মত এত বড় একজন লোকের ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হবার প্রয়োজন আছে। আপনারা নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না যদি আমি টেলিফোনে এই রিলিজ অর্ডার আর আপনাদের আইডেন্টিটি পেপারের সত্যতা সম্পর্কে জেনারেল মোহন সিং-এর সাথে একটু আলাপ করি?'

অনেক কষ্টে মুখের চেহারাটা ঠিক রাখল রানা। এই সাধারণ কথাটা একবারও ভাবল না কেন ওরা? অলক্ষ্যে হাতটা চলে গেল পিস্তলের কাছে। মুখে বলল, 'নিশ্চয়ই। এত বড় একজন লোক! আপনার তো ফোন করে জেনে নেয়াই উচিত।' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় রানার কণ্ঠে।

'না থাক। তাহলে আর দরকার নেই। সন্দেহের কিছু থাকলে ফোন করতাম। কিন্তু শুধু শুধু ফোন করলে বিরক্তি বোধ করবেন হয়তো জেনারেল। আমাদের তো সবদিক দিয়েই জ্বালা। বুঝলেন না?' হাসল জেলার। টেবিলের ওপর রেখে ঠেলে দিল সে কাগজগুলো ওদের দিকে। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রানার।

একটা কাগজ ছিঁড়ে নিল জেলার প্যাড থেকে। কিছু লিখল তার ওপর, অফিশিয়াল সীল দিল সই করবার পর, একজন লোক ডেকে তার হাতে দিল চিঠিটা। কোনও কথা না বলে হাত নেড়ে বিদায় করে দিল লোকটাকে।

'পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। আনতে পাঠিয়েছি।'

পাঁচ মিনিট লাগল না। ঠিক বিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই দুই দিকের দুটো দরজা খুলে গেল। ডক্টর সেলিম নয়, চার দুগুণে আটজন সশস্ত্র প্রহরী ঢুকল ঘরের ভেতর। কিছু বুঝবার আগেই হাতকড়া পড়ল দু'জনের হাতে। বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল জেলার এদিক-ওদিক।

'আপনারা দয়া করে নিজগুণে ক্ষমা করবেন আমাকে। এই অভিনয়টুকু না করলে আজই শ্মশানঘাটের চিতায় উঠতে হত। তাই করতেই হলো। চিঠিটা যে লিখলাম, ওটা প্রফেসর খানের রিলিজের জন্যে নয়, আপনাদের অ্যারেস্টের জন্যে।' যেন একঘেয়েমিতে ভুগছে এমন ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জেলার। 'মেজর মাসুদ রানা, আপনি বড় নাছোড়বান্দা লোক।'

আট

কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না রানা চোখে। কয়েক সেকেণ্ড পর ধীরে ধীরে আবার ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে জেলারের বিষণ্ণ মুখ। আকস্মিক বিস্ময়ের ধাক্কাটা সহ্য হয়ে আসতেই স্পষ্ট বুঝতে পারল রানা, এতক্ষণ ওদেরকে খেলাচ্ছিল জেলার। পরিচয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না জেলারের মনে গোড়া থেকেই। বোকার মত ধরা পড়েছে ওরা এদের প্ল্যান করা ফাঁদে। আর এখানে ধরা পড়া মানেই…।

হাত-পা বাঁধা হয়ে যেতেই রানা এবং জিঞ্জিরের পিস্তল দুটো বের করে রাখা হলো সামনের টেবিলের ওপর, তারপর বেরিয়ে গেল গার্ডরা। ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল জেলার, 'কনফারেন্সটা শ্রীনগরে করবার একটা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল আমাদের। আপনি একজন ইন্টারন্যাশনাল ফিগার হয়ে যাবেন, মেজর মাসুদ রানা। শ্রীনগর এখন ছেয়ে গেছে সারা বিশ্বের জার্নালিস্টে। আমরা সিজ ফায়ার-লাইনের ওপারের গার্ডদের উস্কানি দিলেই গোলাগুলি চালাতে আরম্ভ করবে ওরা। সমস্ত বহির্বিশ্বকে আমরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব পাকিস্তান ভারতের সাথে কোনও সমঝোতায় আসতে চায় না। তার ওপর আগামীকালই শ্রীনগরে পাবলিক কোর্টে বিচার হবে আপনার। চিন্তা করুন, ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরে পাকিস্তানী স্পাই। কত বড় আলোড়নটা হবে ভাবুন একবার!' একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ টানল সে।

তারপর বলল, 'আপনাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এই দুর্দশায় পড়লেন কি করে? কারণটা জানাতে আমার আপত্তি নেই। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আপনাদের প্রতিভাবান এবং আশ্চর্য রকমের দুঃসাহসী বন্ধু, যিনি এ-আরবিকে-র মেজর রামপাল যোশী হিসেবে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত আপনাদের ডুবিয়েছেন।'

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। জিঞ্জিরের মুখের দিকে চাইল রানা। কোনও ভাব পরিবর্তন নেই জিঞ্জিরের মুখে।

'সে তো হতেই পারে,' বলল সে গম্ভীর মুখে।

'তাই হয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবত কর্নেল চাগলার মনে সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ ঠিক নয়, সন্দেহের ছায়া। কিন্তু গত পরশুদিন সন্দেহটা ঘনীভূত হয়ে স্থির বিশ্বাসে পরিণত হতেই জেনারেল মোহন সিং-এর সঙ্গে মিলে একটা ফাঁদ পেতেছিল সে যোশীর জন্যে। এই জেলখানার নাম কথায় কথায় যোশীর কাছে বলা হয়েছে, তার ওপর মোহন সিং-এর অফিস কামরায় ঢুকে কাগজপত্র আর সীলমোহর ব্যবহারেরও সুযোগ দেয়া হয়েছে তাকে। অসঙ্কোচে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে আপনাদের বন্ধু এবং নিশ্চিন্তে পা দিয়েছে কর্নেল চাগলার ফাঁদে। যত বুদ্ধিমানই হোক, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়।'

'এতক্ষণে নিশ্চয়ই মারা গেছে সে?'

'না, বেঁচে আছে। এবং সুখেই আছে। জানেও না, দাবার ছকটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ওকে কি একটা কাজে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন কর্নেল। বিকেল বেলা ফেরত এলে পরে এই সমস্ত প্রমাণসহ নিজ হাতে তাকে অ্যারেস্ট করবার বাসনা পোষণ করেন তিনি। বিকেলে ধরা পড়বে যোশী, রাতেই কোর্টমার্শাল হয়ে যাবে ওর হেডকোয়ার্টারে। কিন্তু আমার যতদূর ধারণা ওর মৃত্যুটা চরম নির্যাতনের মৃত্যু হবে।'

'তা তো হবেই। প্রত্যেকটি এ-আরবিকে অফিসারের সামনে তিলে তিলে মারা হবে ওকে—যাতে আর কখনও কারও ওর পদাঙ্ক অনুসরণ করার সাহস না হয়। তাই না?'

'হ্যাঁ। আপনার নাম?'

'জিঞ্জির।'

'ছদ্মনামে চলবে না···কিন্তু তার আগে নিজের পরিচয় দেয়াই ভদ্রতা। আমার নাম শচীন্দ্র আইচ। নাগাবলের অস্থায়ী জেলার। আসলে আমি কেমিস্ট্রির একজন রিসার্চ স্কলার—সম্প্রতি অক্সফোর্ড থেকে পি. এইচ. ডি. করেছি। রিসার্চের সূত্রেই এখানে কাজ করছি আমি। আমার ওপর আদেশ দেয়া হয়েছে মেজর মাসুদ রানার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করার জন্যে। আর সাথের ভদ্রলোকের কাছ থেকে সত্যিকার পরিচয় এবং দলের সামগ্রিক কার্যকলাপ, ঠিকানা, ইত্যাদি বের করবার পবিত্র দায়িত্বও আমার। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মধ্যযুগীয় শারীরিক নির্যাতন করে কথা আদায় করবার আমি ঘোর বিরোধী। তাছাড়া দৈহিক নির্যাতন করে যে আপনাদের দু'জনের কারও কাছ থেকেই কোনও কথা আদায় করা যাবে না, তা আমি আপনাদের চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। বিংশ শতাব্দীতে ইন্টারোগেশনের যে-

সব চমৎকার নিয়ম বেরিয়েছে, আমরা অতি যত্নের সঙ্গে সে-সব ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছি। একটি চিহ্নও থাকবে না আপনাদের শরীরে অথচ সব কথা জানতে পারব আমরা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই।'

'ব্রেন ওয়াশ?' জিজ্ঞেস করল জিঞ্জির।

'হ্যাঁ। এক্ষুণি কফি এসে যাবে আপনাদের জন্যে। ওটা দিয়েই শুরু হবে।' কথাটা শেষ হওয়ার আগেই একটা ট্রের ওপর সাজানো দু'কাপ কফি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল একজন গার্ড। 'কফিটুকু খেয়ে নিতে হবে। না খেলে নাকে টিউব ভরে খাওয়ান হবে। কাজেই আশাকরি ছেলেমানুষী করবেন না।'

বিনা বাক্যব্যয়ে দু'জনে খেয়ে নিল কফি।

'অ্যাকটেড্রিন বলে একটা কেমিক্যাল মেশানো আছে এই কফিতে। প্রথম কয়েক মিনিট বেশ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে আপনাদের নার্ভগুলো, তারপরই আসবে ভয়ঙ্কর মাথাধরা, ঘুম ঘুম ভাব, আলস্য—কিন্তু নার্ভগুলোর টেনশন্ বাড়তেই থাকবে। ধীরে ধীরে মানসিক ধৈর্য হারাতে থাকবেন আপনারা। দু'ঘণ্টা পর একই ডোজ দেয়া হবে আবার। তারপর একটা ইন্‌জেকশন্ দিতে হবে আপনাদের।' গার্ডের দিকে ইঙ্গিত করতেই একটা সিরিঞ্জ দেখা গেল ওর হাতে। 'মেস্‌ক্যালিন্ ইনজেক্‌শন্। অনেকটা স্কিযোফ্রেনিয়ার মত অবস্থা হবে অ্যাকটেড্রিনের সাথে মেস্‌ক্যালিন পড়লে। এর আধঘণ্টা পর আমার নিজের আবিষ্কৃত একটা ওষুধ ইন্‌জেক্ট করা হবে আপনাদের শরীরে। অল্পদিন হলো আবিষ্কার করেছি ওষুধটা, তাই নামকরণ হয়নি এখনও। এই তিনটি ওষুধ বার দুই রিপিট করলেই ইচ্ছাশক্তি বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না আপনাদের মধ্যে—অবসাদে সম্পূর্ণ ভেঙে যাবে মনের জোর। তখন কথার খৈ ফুটবে আপনাদের মুখে। সত্যি কথা তো বেরোবেই, আমরা আমাদের কিছু কথাও ঢুকিয়ে দেব আপনাদের মাথায়—সেটাই তখন আপনাদের কাছে সত্য হবে। যাক্ মোটামুটি ব্যাপারটা শুনলেন, এখন আপনাদের কামরায় গিয়ে বিশ্রাম করুন।'

একটা বেল বাজাতেই কয়েকজন গার্ড এসে পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে দাঁড় করাল ওদের। জেলার নিজেই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। দু'পাশে দুইজন এবং পেছনে পিস্তল হাতে একজন প্রহরী চলল সাথে। পালাবার পথ তো দূরে থাক, এদের হাত থেকে মুক্তির চিন্তাও এল না রানার মনে। এদের হাত থেকে নিস্তার নেই—শেষবারের মত পৃথিবীর আলো বাতাস আর সবুজ দেখে নিতে ইচ্ছে করল রানার। কিন্তু আলোও নেই, বাতাসও নেই; সবুজও ঢাকা পড়েছে ধূসর তুষারে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে চলল সে পেছনের ধাক্কায়। একটা দরজার তালা খুলল জেলার।

'শেষ দেখা দেখিয়ে নিয়ে যাই। আসুন।'

চিনতে পারল রানা। ডক্টর সেলিম খান। একটা নোংরা বিছানায় শুয়ে ছিলেন তিনি। এই তিন দিনেই আরও কয়েক বছর বেড়ে গেছে যেন ওঁর বয়স। মুখের কয়েক জায়গায় কাটা দাগ—শারীরিক নির্যাতনের স্পষ্ট প্রমাণ। ভয়ানক দুঃখ হলো রানার।

পায়ের শব্দে চমকে উঠে বসলেন সেলিম খান। তীব্র দৃষ্টিতে জেলারের দিকে

চেয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি। যত অত্যাচারই করো না কেন, আর না। আর আমি তোমাদের হয়ে কাজ করব না। এর চেয়ে মৃত্যুই হোক আমার।' হঠাৎ রানার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে মেলে চাইলেন তিনি। 'তোমাকেও ধরে এনেছে তাহলে শয়তানরা?'

রানা কোনও জবাব দিল না। কথা বলল জেলার।

'আমরা ওঁদের ধরে আনিনি, ওঁরাই এসে ধরা দিয়েছেন। ভাঁওতা দিয়ে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে এসেছিলেন ওঁরা নাগাবল কারাগারে।'

রানার দিকে চেয়ে রইলেন সেলিম খান। বললেন, 'তোমার জন্যে আমি দুঃখিত, মিস্টার মাসুদ রানা। আমাকে রক্ষা করতে এসেই তোমাকে এই অকালে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি: তোমার জন্যে আমি গর্বিতও।' হঠাৎ আর একটা কথা মনে হলো ওঁর। 'আচ্ছা বলতে পারবে আমার স্ত্রী এখন কোথায়?'

'ঢাকায়। গতকালই তিনি নিরাপদে পৌঁছেছেন পাকিস্তানে।'

খুশির চোটে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন ডক্টর সেলিম। পারলেন না। পায়ে শেকল বাঁধা থাকায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন বিছানার ওপর উপুড় হয়ে।

'তুমি বাঁচালে আমাকে, মিস্টার মাসুদ রানা। এখন আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব। আমার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করার ভয় দেখিয়ে এতদিন কাজ আদায় করেছে ওরা আমার কাছ থেকে। মৃত্যু এমনিতেই হত, এখন আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শুধু দুঃখ এইটুকু, সম্পূর্ণ অনাত্মীয় পরিবেশে মরতে হচ্ছে আমাকে।'

হঠাৎ এই সময় কথা বলে উঠল জিঞ্জির।

'আপনার মৃত্যুর এখনও অনেক দেরি আছে, ডক্টর সেলিম। সেটা যখন হবার হবে যথা সময়ে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবেন।' কথাগুলো অদ্ভুত শোনাল জিঞ্জির বাঁধা জিঞ্জিরের মুখে। কিন্তু গলার স্বরে এমনই একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে জেলার পর্যন্ত চমকে উঠল।

'আপনি নিশ্চয়ই পরকালে দেখা হওয়ার কথা বলছেন?' সামলে নিয়ে টিটকারির কণ্ঠে বলল জেলার।

'না। ইহকালেই। এক সপ্তাহের মধ্যে।'

'নিয়ে চলো হে...' বলল জেলার গার্ডদের। 'এখনি খারাপ হয়ে গেছে মাথাটা।'

এই নির্যাতনের তুলনা হয় না। স্নায়ুগুলো যেন কেউ ধারাল নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। পেটের ভেতর পাকস্থলীতে বেড়ালের লোম দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে যেন কেউ। দেহের সমস্ত পেশীগুলোতে টান পড়ছে, আবার ঢিল হচ্ছে। নিজেকে ভেঙে-চুরে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে রানার। অস্বস্তিটা যাচ্ছে না কিছুতেই। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নেও মানুষ কল্পনা করতে পারবে না এই নির্যাতনের সত্যিকার স্বরূপ।

কেউ যেন অসংখ্য মাকড়সা ছেড়ে দিয়েছে রানার গায়ে। শিরশির করে হেঁটে বেড়াচ্ছে সেগুলো দেহের ওপর। কোথাও যেন বাতাস নেই। শ্বাস নিতে কষ্ট

হচ্ছে। মাথার পেছন দিকটা যেন কেউ চেপে ধরেছে সাঁড়াশী দিয়ে—চোখ দুটোয় অসম্ভব ব্যথা। সবকিছু অন্ধকার হয়ে এল ওর কাছে। মনে হলো অনেক দূর থেকে কে যেন নাম ধরে ডাকছে ওকে। বারবার ডাকছে। কি যেন বলতে চাইছে। কিন্তু শুনতে ইচ্ছে করছে না ওর।

অনেকক্ষণ পর চিনতে পারল রানা গলাটা। জিঞ্জির।

'মাথাটা উঁচু রাখো, রানা। রানা, রানা! মাথাটা উঁচু রাখো!' বারবার বলছে কথাটা জিঞ্জির।

'যেন মস্ত ভার তুলছে এইভাবে ধীরে ধীরে মাথাটা তুলল রানা। তারপর আবার ঝুলে পড়তে আরম্ভ করল সেটা সামনের দিকে।

'আবার ঝুলে পড়ছে রানা, তুলে ধরো। মাথা উঁচু করো।' গমগম করে উঠল জিঞ্জিরের কণ্ঠ। নিজের ইচ্ছাশক্তি ধার দিচ্ছে ওকে জিঞ্জির। ওর কণ্ঠে জাদুকরের সম্মোহন। আলগা মাথাটা আবার সোজা করল রানা। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। হয়েছে। এইবার চোখ খুলে চাও। সোজা আমার দিকে তাকাও।'

চোখ খুলে রানা দেখল তারই মত বাঁধা রয়েছে জিঞ্জির চেয়ারের সাথে। লাল হয়ে গেছে ওর চোখ দুটো। বলল, 'মাথাটা নিচে নামতে দিয়ো না, রানা। চোখ খুলে রাখো। ধীরে ধীরে কেটে যাবে। কেমিক্যালের রিঅ্যাকশন কমে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। নিজেকে শক্ত করে রাখো, ঢিল দিলে আর ফিরে আসতে পারবে না।'

অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে জিঞ্জির। নিজের জীবনের নানা গল্প, রুবিনার গল্প, মাহমুদের সব হারানোর কথা। রানার মাথা ঝুলে পড়তে চাইলেই সাবধান করছে। ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল অস্বস্তিটা। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওষুধের গুণ। শেষে অপরিসীম ক্লান্তি ছাড়া আর কোনও অসুবিধে থাকল না রানার দেহে।

ঘণ্টা তিনেক পর কয়েকজন প্রহরী এসে পায়ের শেকল খুলে দিল ওদের। ডেকে পাঠিয়েছে জেলার। দ্বিতীয় কোর্স দেয়া হবে। ওরা উঠে দাঁড়াতেই সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসছিল দু'জন লোক—সরিয়ে দিল জিঞ্জির। রানাও সাহায্য নিল না। মাথা সোজা রেখে হেঁটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অফিস কামরায় বসেছিল জেলার। ওদেরকে সোজা হেঁটে ঘরে ঢুকতে দেখে হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। দুই চোখে অবিশ্বাস। কিন্তু সামলে নিল সে।

'অন্য কারও মুখ থেকে খবরটা শুনলে তাকে মিথ্যুক বলতাম, কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কি করে? আপনারা অদ্ভুত লোক। দ্বিতীয় কোর্সের পর আপনাদের কি অবস্থা হয় দেখবার অদম্য কৌতূহল হচ্ছে আমার। বিশেষ করে যখন কর্নেল চাগলার কাছে শুনলাম জিঞ্জির মানে দুর্দান্ত সেই ইতিহাস সৃষ্টিকারী মেজর জেনারেল দিলদার বেগ। আপনাকে বন্দী করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি আমি। কিন্তু...'

ঘরের একদিকে চাইল সে। রানাও চেয়ে দেখল এ-আরবিকে পোশাক পরা কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওদের পেছনে। প্রথমেই চোখ পড়ল শম্ভুর ওপর। সবার মাথা ছাড়িয়ে হাতখানেক ওপরে উঠে গেছে ওর মাথাটা। ভয়ঙ্কর একটা নিঃশব্দ হাসি দেখা গেল ওর মুখে। আর একজনকে চিনতে পারল রানা। সে-ও

ছিল সেদিন ভ্যানের মধ্যে। তারপরই চোখ পড়ল ওর একজন লোকের ওপর। একটু তফাতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে সিগারেট টানছিল সে, ঘুরে দাঁড়াতেই দেখা গেল ফজল মাহমুদ।

নয়

মাহমুদ না তার প্রেতাত্মা? চোখ দুটো বসে গেছে—কালি পড়েছে চোখের কোণে। কিন্তু কুছ পরোয়া নেই ভাবটার কিছুমাত্র পরিবর্তন নেই। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চাইল সে ওদের দিকে, তারপর এগিয়ে এল।

তাহলে? একটা বিশ্রী সন্দেহ উঁকি দিল রানার মনে। মাহমুদের তো মুক্ত থাকার কথা নয়! মুক্ত তো আছেই, নিশ্চিন্তে নিজের পোস্টেই আছে সে। এর মানে কি? এক টুকরো বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে...'

ঠাস করে এক চড় পড়ল রানার গালে। এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়েছে সে, তার ওপর বেশ ওজনদার চড়ই মেরেছে মাহমুদ। মাথাটা ঘুরে উঠল ওর। কোনওমতে একটা চেয়ার ধরে খাড়া থাকল সে দু'পায়ের ওপর।

'শিখে রাখো। প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে। তার বেশি একটা কথাও শুনতে চাই না।' যেন ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করেছে এমনি বিরক্ত দৃষ্টিতে হাতটার দিকে চাইল সে একবার, তারপর সেই একই দৃষ্টিতে চাইল জেলারের দিকে। 'এদের প্রথম ডোজ দেয়া হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনারা দ্বিতীয় থেকে আরম্ভ করবেন, ক্যাপ্টেন লালা। আমি সব কিছু এই ব্যাগে ভরে দিয়েছি ইনস্ট্রাকশনসহ। কোনও অসুবিধে হবে না। দুঃখ এই, আমি নিজের হাতে...'

'দুঃখ করবেন না। জেনারেলের কাজ হয়ে গেলেই আপনার লোক আপনাকে ফেরত দেয়া হবে। তবে আস্ত পাবেন কিনা বলতে পারি না।' মৃদু হাসল মাহমুদ। তারপর শম্ভুর দিকে ফিরে বলল, 'কি হে, বাচ্চা হাতী, বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোলো এগুলোকে গাড়িতে।'

শম্ভুর প্রকাণ্ড থাবা মুঠি করে ধরল রানার চুল। তারপর প্রায় ঝোলাতে ঝোলাতে বের করে নিয়ে চলল অফিস কামরা থেকে। রিসার্চ-স্কলার কেমিস্ট প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'ক্যাপ্টেন লালা, দয়া করে একটু দেখবেন যেন যেমন নিয়ে যাচ্ছেন তেমনিই ফেরত দিতে পারেন। আমার হয়ে বলবেন...'

'আমার কথা কর্নেল চাগলা শুনলে তো? তবু বলে দেখব। আচ্ছা, আর দেরি করা যায় না, চলি এখন।'

হেঁচড়ে নিয়ে এসে তোলা হলো ওদের এ-আরবিকে ট্রাকে। রানা দেখল, ডক্টর সেলিম খানকেও নিয়ে আসা হয়েছে আগেই। শম্ভু এবং আরও দু'জনকে নিয়ে মাহমুদও উঠল ট্রাকের পেছনে। প্রত্যেকের হাতের সাবমেশিনগান তৈরি থাকল।

ছেড়ে দিল ট্রাক।

একটা ম্যাপ বের করে খানিকক্ষণ কি যেন দেখল মাহমুদ। তারপর ড্রাইভারকে বলল, 'পাঁচ মাইল পর হাতের ডাইনে একটা সরু রাস্তা পড়বে। সেই রাস্তায় ঢুকে চলতে থাকবে আমি থামতে না বলা পর্যন্ত।'

বড় রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়ল ওরা সরু রাস্তাটায়। উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথের ওপরটা তুষার জমে সমান দেখাচ্ছে। ঝাঁকি খেতে খেতে চলল গাড়ি। মাঝে মাঝে পিছলে খাদের মধ্যে পড়ে যেতে চায়। একটা ফার, চিনার আর উইলো গাছের জঙ্গলের ধারে থামাতে বলল মাহমুদ গাড়িটা। লাফিয়ে নামল রাস্তায়। পেছন পেছন নামল শম্ভু এবং অন্যান্য গার্ডরা। পিস্তলের ইঙ্গিতে ডক্টর খান, জিঞ্জির আর রানাও নামল।

গাড়িটা ঘুরিয়ে রাখা হলো রাস্তার ওপর এঞ্জিন স্টার্ট দেয়া অবস্থায়।

'সবাই চলো, জলদি। শম্ভু, তুমি পারবে না এই তিনটেকে কন্ট্রোল করতে? পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো পেছনে। একটু নড়াচড়া করলেই শেষ করে দেবে। দয়ামায়ার সময় নেই এখন।'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, স্যার।' কিচমিচ করে উঠল ওর মিকি মাউজ গলা। ভয়ঙ্কর হাসি শম্ভুর মুখে।

প্রত্যেকের হাতে একটা করে কোদাল। জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে মাহমুদ ওদের নিয়ে। অসম্ভব শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে তিনজন। ট্রিগার টেপার কোনও ছুতো বের করা যায় কিনা দেখবার জন্যে গর্জন করে উঠল শম্ভু। 'এই বদমাশ, কাঁপুনি বন্ধ কর্।'

কেউ কোনও জবাব দিল না। খানিকক্ষণ উসখুস করে আবার বলল, 'তোদের জন্যে চমৎকার ব্যবস্থা করতে গেছে ওরা। তিনজনকে একসাথে পুঁতবে। দোয়া-দরূদ পড়, শালারা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, শম্ভুকে আড়াল করে চোখ টিপল জিঞ্জির। এবারও কেউ কোন জবাব দিল না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এল মাহমুদ। একা।

'পুরোদমে কাজ চলেছে। এরা কোনও গোলমাল করেনি তো, শম্ভু?'

'নাহ্,' দুঃখের সঙ্গে জানাল শম্ভু। 'কি গোলমাল করবে, ভয়েই কাঁপছে ঠকঠক করে।'

'দুঃখ কোরো না শম্ভু, তোমাকে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দেয়া হবে। ব্যথাটা কমেছে তোমার?'

'কমেছে, কিন্তু এখনও ফুলে আছে। উহ্—'

অনেক কাছে এসেছিল মাহমুদ। ওর রিভলভারের বাঁটটা সশব্দে পড়ল শম্ভুর মাথার ওপর কানের ঠিক পেছনটায়। পিস্তলটা ছিটকে পড়ল ওর হাত থেকে। দড়াম করে তুষারের ওপর পড়ল শম্ভুর জ্ঞানহীন দেহ।

দশ সেকেণ্ডের মধ্যে হাতকড়াগুলো খুলে গেল। ট্রাকের হুইলে গিয়ে বসল মাহমুদ। তিনজন উঠে বসতেই ছুটল ট্রাকটা যে পথে এসেছিল সেই পথে।

মাইল পাঁচেক এসে থামল মাহমুদ। একটা ফ্লাস্ক নামাল কাঁধ থেকে। সবগুলো দাঁত বেরিয়ে গেছে ওর। 'ব্র্যাণ্ডি। তিন ঢোক করে খেলে চারজনেরই হয়ে

যাবে। নিন শুরু করুন, সাইন্টিস্ট।'

'দিন। শুরু কেন, বলেন তো শেষও করে দিতে পারি,' সাগ্রহে হাত বাড়ালেন ডক্টর সেলিম। গুণে গুণে তিন ঢোক খেয়ে নামালেন ফ্লাস্কটা মুখ থেকে। অবসাদ আর শীতে মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল রানা। ব্র্যাণ্ডিটুকু খেয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেল সে।

'কিন্তু আপনাকে এমন বিধ্বস্ত দেখা যাচ্ছে কেন, মি. মাহমুদ? আপনার শরীর কেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'শারীরিক কুশলাদি নিয়ে পরে আলাপ করা যাবে। এখন লেজ দাবিয়ে প্রাণপণে ভাগতে হবে আমাদের, মিস্টার রানা। চলতে চলতেই গল্প করা যাবে।'

আবার ছুটল গাড়ি। একটা সিগারেট ধরিয়ে শুরু করল মাহমুদ।

'আজকের প্রথম খবর, আজই এ-আরবিকে থেকে রিজাইন করেছি আমি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও।'

'তা তো বটেই,' জিঞ্জির বলল। 'কেউ জানে এখনও?'

'মোহন সিং জানে। আমি অবশ্য লিখিতভাবে কোনও দরখাস্ত দিইনি, কিন্তু হাত-পা বেঁধে যখন ওকে ওর নিজের অফিস কামরার সংলগ্ন বাথরূমে ফেলে এসেছি, তখন এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আর কোনও সন্দেহ নেই।'

'মোহন সিং! মানে তোমার চীফ?' বলল জিঞ্জির চোখ কপালে তুলে।

'এক্স চীফ। হ্যাঁ ওকেই বেঁধে রেখে এসেছি। কিন্তু গোড়া থেকে বলি, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না। কাল উমরকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম যে আমাকে গান্দারবলে পাঠানো হচ্ছে একটা বড় রকমের সিকিউরিটি চেকআপের জন্যে কর্নেল চাগলার আদেশে। চাগলা নিজেই যেত, কিন্তু বারামূলায় ওর একটা জরুরী কাজ আছে বলে আমাকে পাঠাচ্ছে। ক্যাপ্টেন লালা আর জনা দশেক সেপাই নিয়ে চলে গেলাম গান্দারবলে সকাল সকাল। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কারণ, সকাল বেলা বেরোবার সময় হঠাৎ একটা আয়নায় চোখ পড়তেই দেখলাম আমাদের চীফ অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে। মোহন সিং-এর পক্ষে এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়—ব্যাটা নিজের বউকেও বিশ্বাস করে না। কিন্তু কেমন একটু সন্দেহ হলো।'

'লোককে সন্দেহ করা আপনার একটা বদ-অভ্যাস,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'সেজন্যেই এখনও বেঁচে আছি, বন্ধু। সন্দেহটা মন থেকে দূর করে দিয়ে যখন গান্দারবলে প্রায় পৌঁছে গেছি এমন সময় ক্যাপ্টেন লালা একেবারে ভূত দেখানো চমকে দিল আমাকে একটা সাধারণ কথা বলে। কথায় কথায় বলল কর্নেলের ড্রাইভারের সাথে কথা হচ্ছিল ওর আজ সকালে, শুনল কর্নেল যাচ্ছে নাগাবল কারাগারে, ওখান থেকে যাবে উলার লেকের দিকে।'

বড় রাস্তায় উঠে ছুটল ওরা শ্রীনগরের দিকে।

'এই এক কথায় সবকিছু আমার কাছে পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাকে গান্দারবলে সরিয়ে দেয়া, মোহন সিং-এর বাঁকা দৃষ্টি, কর্নেল চাগলার মিথ্যে কথা, আমাকে নাগাবলের খবর দেয়া, চীফের অফিসে ঢুকে অতি সহজেই কাগজপত্র জোগাড়ের সুযোগ, সবগুলোর মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেলাম। কিভাবে আমাকে সন্দেহ করল ওরা জানি না, এখনও সেটা আমার কাছে রহস্যই রয়ে

গেছে।

'বুঝলাম, সর্বনাশ হয়ে গেছে। তবে মনে হলো, হয়তো আমার ব্যাপারটা চাগলা ও মোহন সিং-এর বাইরে জানাজানি হয়নি। লালা যেমন কিছুই জানে না, তেমনি হেডকোয়ার্টারের আর সবাইও নিশ্চয়ই কিছুই জানবে না। সন্দেহপ্রবণ মোহন সিং আর প্রতিভাবান চাগলা কাউকে বলবার সাহস পাবে না জানাজানির ভয়ে। কাজেই গান্দারবলে পৌঁছে সবাইকে বিকেল পর্যন্ত চারদিকে ত্রাসের সঞ্চার করবার হুকুম দিয়ে ক্যাপ্টেন লালাকে নিয়ে ঢুকলাম একটা পোড়ো বাড়িতে।' একটু হাসল মাহমুদ। 'বেচারা এখনও বোধহয় সেই পোড়ো বাড়ির গুদাম ঘরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু কি করব, উপায় ছিল না আর। ওর আইডেন্টিটি কার্ড কেড়ে নিয়ে ছুটলাম শ্রীনগর। হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে সোজা চলে গেলাম মোহন সিং-এর অফিস কামরায়।

'তারপরের ঘটনাগুলো অত্যন্ত সহজ। সাংঘাতিক রকম চমকে উঠল মোহন সিং আমাকে দেখে। ওর হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম পিস্তলের নলটা। ওকে দিয়ে লিখিয়ে নিলাম আপনাদের মুক্তি সনদ। প্রাণের ভয় সবারই আছে। সীল দিয়ে সই করল সে চিঠিটা। এমন ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলাম ব্যাটাকে যে চোখ আর ভুরু জোড়া ছাড়া কিছুই নড়াবার উপায় রইল না ওর। মুখের মধ্যে আগেই ঠেসে দিয়েছিলাম কাপড়। তারপর নাগাবলের ডাইরেক্ট টেলিফোনটা তুলে মোহন সিং-এর কণ্ঠস্বর নকল করে জেলারকে বললাম, ক্যাপ্টেন লালা বলে একজনকে পাঠাচ্ছি সেই তিনজন বন্দীর জন্যে, সাথে নিজ হাতে লেখা চিঠি যাচ্ছে—বিনা দ্বিধায় যেন সে লালার হাতে দিয়ে দেয় বন্দীদের। কয়েকজন মিনিস্টার অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। মোহন সিং-এর চেহারাটা তখন দেখবার মত হয়েছে।'

'কিন্তু চাগলা যদি থাকত অফিসে, কিংবা…'

রানার প্রশ্ন শেষ করতে দিল না মাহমুদ। 'চাগলা এখন বন্দীপুরায়। তুষার পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে সকাল থেকেই, আপনারা যে গাড়িতে করে নাগাবল গিয়েছিলেন তার চাকার দাগ ধরে সে উল্টো দিকে ছুটেছে আমাদের গোপন আস্তানা বের করবার আশায়।'

'রুবিনা?' কালো হয়ে গেল জিঞ্জিরের মুখ দুশ্চিন্তায়।

'রুবিনা কে?' জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক।

'আমার মেয়ে। রুবিনার কি হবে?'

'উমরকে পাঠিয়েছি শর্টকাট রাস্তায় গিয়ে রুবিনাকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে। আমরা এখন চলেছি আমাদের আসল আস্তানায়, রামপুরে। যাক, যা বলছিলাম, জেলারের সাথে কথা বলবার সময় বারবার 'হ্যাঁচ্চো' করছিলাম। জেলার জিজ্ঞেস করায় বললাম ভয়ঙ্কর সর্দির পূর্বাভাস। তার কারণটা বলছি পরে। ফোন সেরে ইন্টারকমে অফিসের সবাইকে ধমকে দিলাম মোহন সিং-এর গলায়। আগামী তিন ঘণ্টার মধ্যে যদি কেউ আমাকে কোনও ভাবে ডিসটার্ব করে তাহলে আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলব। মিনিস্টারও যদি টেলিফোন করে তবু কানেকশন দেবে না। তারপর সেই একই কণ্ঠে মেজর যোশীর জন্যে একটা ট্রাকের ব্যবস্থা করতে বললাম নিচে,

সাথে চারজন গার্ডও যাবে। সবশেষে টেনে অ্যাটাচড্ বাথরুমে নিয়ে গেলাম মোহন সিং-কে। ওর পেছন দিকটায় একটা মাঝারি রকমের লাথি লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বাইরে থেকে তালা মেরে চাবিটা নিয়ে চলে এলাম। ইশশ্, এতগুলো বুদ্ধিমান লোককে ঘোল খাইয়ে দিয়ে সত্যিই আনন্দ হচ্ছে। আজ সারারাত ঘুমই আসবে না আমার।'

এই অদ্ভুত লোকটার প্রশংসা করবার ভাষা পেল না রানা। ডক্টর সেলিম মাহমুদের পরিচয় শুনে ছেলেমানুষের মত হাসতে থাকলেন। কিন্তু জিঞ্জিরের মন থেকে রুবিনার জন্যে দুশ্চিন্তা গেল না।

গাড়ি থামাল মাহমুদ রাস্তার ওপর কিছু দেখে। বাইরের দিকে চাইতেই দেখতে পেল রানা খামিসু খানকে। হাতে একটা ছোট ব্যাগ। মৃত্যু গহ্বর ফেরত জিঞ্জির আর রানাকে দেখে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল খানের মুখ। রানা লক্ষ করল হাসলে আরও খারাপ দেখায় ওকে—কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় ওর সরল সাদাসিধে অকৃত্রিম হৃদয়টা।

আবার ছুটল ট্রাক। আবার পড়তে শুরু করেছে তুষার। খানের হাতের ব্যাগটার কথা জিজ্ঞেস করায় আবার হেসে উঠল মাহমুদ। বলল, 'নাগাবলে যাওয়ার সময় উমরকে বন্দীপুরায় পাঠিয়ে খানের কাছে দিয়ে গিয়েছিলাম এই ব্যাগ। টেলিফোন ট্যাপ করবার যন্ত্রপাতি আছে এতে। একটা টেলিফোন পোলে চড়ে বসে ছিল খান। জেলার যদি ক্যাপ্টেন লালার হাতে বন্দীদের ছাড়বার আগে মোহন সিংকে ফোন করত তাহলে মুখে রুমাল চেপে উত্তর দিত খান। জেলার বুঝত মোহন সিং-এর সর্দি বেড়ে গেছে আরও, তাই সন্দেহ করতে পারত না।'

'আশ্চর্য! এক বিন্দু ফাঁক রাখেননি কোথাও!' বলল রানা।

এই প্রশংসার উত্তর দিল না মাহমুদ কোনও। বলল, 'সব ভাল যার শেষ ভাল। এখন যত শিগগির সম্ভব আপনাদের বর্ডার পেরোতে হবে। দেরি হলেই আবার বিপদ হবে। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত জায়গায় ইনফরমেশন চলে যাবে। সবাইকে সাবধান করে দেয়া হবে। একটা ছুঁচোও বেরোতে পারবে না ওদের হাত গলে।'

একটানা তিন ঘণ্টা চলবার পর জিঞ্জিরের আস্তানার কাছে পৌঁছল ওরা। নদী পেরিয়ে আর দশ মাইলের মধ্যেই বর্ডার। গাড়ি না থামিয়ে সোজা ওদেরকে বর্ডার পার করে দিতে চেয়েছিল মাহমুদ। কিন্তু আপত্তি করল রানা। রুবিনাকে নিয়ে এতক্ষণে পৌঁছে গেছে উমর এই আস্তানায়। রুবিনার সাথে দেখা না করে চলে যেতে কিছুতেই সায় দিল না ওর মন। মৃদু হেসে চাইল একবার মাহমুদ রানার দিকে—তারপর বাঁয়ে মোড় নিল গাড়ি। দশ মিনিটের মধ্যে এসে দাঁড়াল ট্রাকটা জিঞ্জিরের আস্তানায়।

ছুটে গাড়ির কাছে এল উমর। ওর চোখ-মুখের চেহারা দেখেই চমকে উঠল জিঞ্জির। 'কি হয়েছে উমর? রুবিনা কোথায়?'

মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল উমর কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'ধরে নিয়ে গেছে—কর্নেল চাগলা। আমি পৌঁছবার আগেই।'

দশ

বজ্রাহতের মত বসে থাকল গাড়ির সবাই কয়েক মুহূর্ত। মাহমুদই সামলে নিল সবচেয়ে আগে। স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে নেমে গেল গাড়ি থেকে। সবাই নামল একে একে। নিঃশব্দে মাহমুদের পিছু পিছু গিয়ে ঢুকল দোতলা বাড়িটার মধ্যে। ড্রইংরুমে বসে পড়ল সবাই।

ঠিক সেই সময়ে বেজে উঠল টেলিফোন। জিঞ্জির তুলে নিল রিসিভার। ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখটা। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুনল মন দিয়ে তারপর বলল, 'দিন ওকে।' আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। ঘরের প্রত্যেকটি প্রাণী পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে রইল। 'তুই আমাদের ঠিকানা বললি কেন, মা?' আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। 'অসম্ভব। এটা কিছুতেই হতে পারে না, কর্নেল।' আবার চুপ। 'আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করছি।' নামিয়ে রাখল জিঞ্জির রিসিভারটা। রানা লক্ষ করল হাতটা কাঁপছে জিঞ্জিরের।

একটা সোফায় বসে দুইহাতে চোখ ঢেকে কিছুক্ষণ নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করল জিঞ্জির। তারপর সামলে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে চাইল সবার দিকে। বলল, 'কর্নেল গোয়েন্কারাম চাগলা ফোন করেছিল। রুবিনাকেও দিয়েছিল টেলিফোনটা এক মিনিটের জন্যে যাতে ওর কথার গুরুত্ব দিই আমরা। এই ঠিকানা জানত না সে। কিন্তু চালাকি করে বের করে নিয়েছে। খালি ঘরে টেলিফোনের সামনে রুবিনাকে রেখে পাশের ঘরে গেছে সে কোনও ছুতো ধরে। আমাদের সাবধান করবার জন্যে এই ফোন নাম্বারে ডায়াল করেছে রুবিনা। সাথে সাথেই ধরা পড়েছে ওদের ফোন অপারেটারের কাছে।'

'কোথা থেকে ফোন করেছে চাগলা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এ-আরবিকে হেডকোয়ার্টার।'

'আমরা চললাম। আপনি ডক্টর সেলিম খানকে বর্ডার পার করবার ব্যবস্থা করুন। আমি আর মাহমুদ যাব শ্রীনগর। যে করে হোক ছুটিয়ে আনব রুবিনাকে।'

'কারও সাধ্য থাকলে তোমাদের দু'জনেরই আছে। কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব নয়, রানা। তোমরাও আর পারবে না ওকে ছুটিয়ে আনতে।'

'কি চায় চাগলা?' এবার প্রশ্ন করল মাহমুদ।

'বদলা-বদলি।'

'অর্থাৎ ডক্টর সেলিমের বদলে রুবিনাকে ফেরত দিতে পারে, এই তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এটা অসম্ভব। ডক্টর সেলিমকে...'

'সম্ভব।' এতক্ষণ পর দৃঢ়কণ্ঠে কথা বলে উঠলেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক। 'আমি ফিরে যাব।' জিঞ্জিরকে মাথা নাড়তে দেখে বললেন, 'আমার কোনও ক্ষতি করবে না ওরা—ওদের অনেক কাজে লাগব আমি। কিন্তু না গেলে আপনার মেয়ের কি অবস্থা হবে ভাবুন একবার। আমার স্বাধীনতার বিনিময়ে যদি কারও প্রাণ রক্ষা হয়...আমি

যাবই।' তাও মাথা নাড়ছে জিঞ্জির। মিনতি ফুটে উঠল প্রফেসরের কণ্ঠে, 'আপনি একটা কথা বুঝতে পারছেন না কেন? যদি বেঁচে থাকি আমার মুক্তির সম্ভাবনা তো রইলই—কিন্তু আমাকে ফেরত না পেলে রুবিনার বাঁচবার কোনও সম্ভাবনাই নেই।'

'আপনি সাহসী লোক, ডক্টর সেলিম। এবং মহৎপ্রাণ। কিন্তু আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারলাম না। আমি চাগলাকে বলছি—'

'আমি বলব,' বাধা দিয়ে বলল মাহমুদ। টেলিফোন বেজে উঠেছে। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল সে রিসিভার।

'আমার বিবেচনার ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিন আপনারা—হ্যাল্লো চাগলা, মেজর রামলাল যোশী বলছি। হ্যাঁ, আপনাদের প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করে দেখেছি, এখন আমাদের দিক থেকে একটা প্রস্তাব আছে, আপনারাও বিবেচনা করে দেখুন। আমার মত একজন সুযোগ্য অফিসারকে হারিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই যার-পর-নাই হৃদযন্ত্রণায় ভুগছেন। আমরা যদি গ্যারান্টি দিই যে পাকিস্তানে পৌঁছে আপনাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবেন না ডক্টর সেলিম, প্রেসেও যাবে না কোনও খবর, তাহলে আপনারা কি ওঁর বদলে আমার মত এই ক্ষুদ্র প্রাণীকে গ্রহণ করতে রাজি হবেন? একটা কথা ভেবে দেখবেন, ওঁকে নিয়ে খুব লাভ হবে না ভারত সরকারের, ওঁকে দিয়ে আর কোনও কাজ করানো যাবে না, জেলের ভাত খাওয়ানো ছাড়া।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি ধরে থাকব।' জিঞ্জির এবং প্রফেসরের প্রবল আপত্তি গ্রাহ্য করল না মাহমুদ। বলল, 'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আত্মত্যাগ ইত্যাদি ভুয়ো কথায় আমার...হ্যাঁ, বলুন, কর্নেল চাগলা...আমাকে একেবারে চুপসে দিলেন, মশাই। নিজের সম্পর্কে যেটুকু উঁচু ধারণা ছিল, ধূলিসাৎ হয়ে গেল।...তাহলে প্রফেসরকেই চাই? হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি এক পায়ে খাড়া।...কি বললেন? শ্রীনগরে? হাসালেন দেখছি! উনি কখনও শ্রীনগরে যাবেন না।...আপনি কি আমাদের পাগল ঠাউরেছেন? উনি শ্রীনগরে গেলে দু'জনই চলে গেল আপনার হাতের মুঠোয়, একজনকে ফেরত দেবার প্রশ্নই ওঠে না। এই যদি আপনাদের সিদ্ধান্ত হয় তাহলে এক্ষুণি উনি বর্ডার পার হয়ে চলে যাবেন।...এই তো, এতক্ষণে বুঝতে পারছেন। মন দিয়ে শুনুন।

'এই বাড়ি থেকে দুই মাইল পুবে ডান দিকে একটা সরু রাস্তা আছে। চিনতে না পারলে রুবিনাকে বললেন, সে-ই চিনিয়ে দেবে। সেই রাস্তা ধরে দুই মাইল গেলে ঝিলাম। সেই রাস্তার শেষ পর্যন্ত গিয়ে একটা খেয়া ঘাটের সামনে পৌঁছবেন আপনারা। আমরা এখান থেকে মাইল তিনেক পশ্চিমে একটা কাঠের ব্রিজ পার হয়ে ওপারে চলে যাচ্ছি এক্ষুণি। ব্রিজটা অবশ্যই ভেঙে দেয়া হবে। আপনারা যেখানটায় পৌঁছবেন ঠিক তার মুখোমুখি নদীর অপর পারে অপেক্ষা করব আমরা। ওখানে, একটা নৌকো আছে পারাপারের জন্যে। ওইখানেই আমাদের বন্দী বিনিময় হবে। সব কথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন শুনল মাহমুদ। সবাই শ্বাসরুদ্ধ করে অপেক্ষা করছে। মাহমুদ বলল, 'আচ্ছা, একটু ধরুন।' মাউথপীসটা হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, 'ব্যাটা বলছে ঘণ্টা খানেক সময় দিতে হবে। গভর্নমেন্ট

পারমিশনের ব্যাপার আছে। তা সত্যিই আছে অবশ্য। কিন্তু এই ঘণ্টাখানেক সময় ব্যাটারা আর্মড্ ফোর্স দিয়ে বাড়িটা ঘেরাও করবার কিংবা প্লেন পাঠিয়ে বম্বিং করবার ব্যবস্থা করবে কিনা কে জানে!'

'সেটা সম্ভব নয়,' বলল জিঞ্জির। 'ওদের ঘাঁটি এখান থেকে চল্লিশ মাইল। এখানে পৌঁছতে অন্ততপক্ষে তিনঘন্টা লাগবে, আর এয়ার ফোর্স এই তুষারের মধ্যে এ-বাড়ি খুঁজেই পাবে না।'

'তাহলে ঝুঁকিটা নেয়া যায়?'

'নেয়া যায়।'

'ঠিক আছে, ঘণ্টাখানেক সময় দেয়া গেল আপনাকে, কর্নেল চাগলা,' মাউথপিস থেকে হাত সরিয়ে বলল মাহমুদ। 'তার চেয়ে এক মিনিট দেরি হলে আর টেলিফোন করবার কষ্ট স্বীকার না করলেও চলবে—আমরা চলে যাব এখান থেকে। আরেকটা কথা। গান্দারবল-বন্দীপুরার রাস্তায় আসবেন। আমাদের সংগঠন কত বিরাট তা তো জানেনেই। সমস্ত রাস্তায় আমাদের লোক থাকবে। যদি কোন গাড়ি অন্য রাস্তায় আসে, এখানে এসে দেখবেন আমরা চলে গেছি। আচ্ছা, দেখা হবে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে।

রিসিভার নামিয়ে রাখল সে, তারপর ঘুরল ঘরের সবার দিকে।

'ডক্টর সেলিমকে যেতেই হচ্ছে। তিন ঘণ্টার মধ্যে।'

উমর ওর পয়েন্ট টু-টু রাইফেলটা পরিষ্কার করতে বসল পুলথ্রু দিয়ে। দশ রাউণ্ডের ম্যাগাজিন। সেমি-অটোমেটিক ব্রোনো। খামিসু খান গম্ভীর মুখে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে জিঞ্জিরের সোফার পেছনে পাঁচ গজ জায়গায়। সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বারবার মাথা নাড়ছে জিঞ্জির। রানা বুঝতে পারছে, ডক্টর সেলিমের বিনিময়ে নিজের কন্যাকে ফিরে পাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে সে মনে মনে। সেলিম খান নির্বিকার চিত্তে দেড়মাস আগের একটা পত্রিকায় মনোনিবেশ করেছেন। কোথা থেকে এক বোতল হুইস্কি নিয়ে এসে বারান্দায় বসেছে মাহমুদ। অনেকক্ষণ থেকে অবিরাম মদ খাচ্ছে সে। অর্ধেক হয়ে গেছে বোতল তবু খেয়েই চলেছে। রানা এসে বসল মাহমুদের পাশে।

'খুব বেশি মদ খাই, তাই না?' বলল মাহমুদ।

'হ্যা, একটু অতিরিক্ত। বিশেষ করে...'

'কিন্তু কেন খাব না, বলুন তো। জিনিসটা আমি পছন্দ করি।'

'আমি নীতিবাগীশ নই। সময় বিশেষে মদ আমিও খাই। কিন্তু ভাবছি পছন্দ করেন বলেই যে আপনি মদ খান, তা নয়।'

'তাহলে কি? ভুলে থাকবার জন্যে?'

'আপনার কথা আমি সব জানি, মি. মাহমুদ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মাহমুদ। তারপর বলল, 'রুবিনাকে বিয়ে করবেন আপনি?'

চমকে উঠল রানা। 'একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?' তবে কি যা বুঝেছিল তাই ঠিক? 'আমাদের মধ্যে এরকম কোনও কথা তো হয়নি এখন পর্যন্ত।'

'খুব ভাল মেয়ে। আপনি ওকে বিয়ে করুন। ও সুখী হবে, আপনাকেও সুখী করবে।'

'আমি চাইলেই কি ও বিয়ে করবে আমাকে?'

'করবে। আমি মেয়েদের মন জানি।'

'আপনি নিজে চেষ্টা করেননি কেন, মিস্টার মাহমুদ? আমার প্রতি হিংসে তো এদিকে পুরোপুরিই আছে!' ঠাট্টা করবার ছলে বলল রানা। চট করে রানার দিকে চাইল মাহমুদ। ম্লান হাসল।

'আমি জানতাম, আপনি ধরে ফেলেছেন আমাকে। আমি খুব অন্যায় করেছিলাম। আপনার ওপর সন্দেহ ফেলে ছোট করতে চেয়েছিলাম আপনাকে রুবিনা আর জিজ্জিরের কাছে। সেদিন শ্রীনগরে জিজ্জিরের বাসায় আপনার ধরা পড়বার কোনও দরকারই ছিল না। কিন্তু আমি হেরে গেছি আপনার কাছে, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনিও যেমন স্পষ্ট বুঝেছিলেন, রুবিনাও বুঝেছিল তেমনি পরিষ্কার। কিন্তু আপনি কিছু বললেন না, চুপচাপ সহ্য করে নিলেন আমার এই কুৎসিত ব্যবহার। আর তাইতেই হেরে গেলাম। আমার চেয়ে আপনি কতখানি বড় তখনই টের পেলাম অন্তর দিয়ে। আমাকে মাফ করবেন না, মিস্টার মাসুদ রানা?' রানার একটা হাত চেপে ধরল মাহমুদ।

ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিল রানা।

'কি পাগলামী করছেন! আপনি প্রাণ বাঁচিয়েছেন আমার। চিরঋণী হয়ে থাকব আপনার কাছে। ওসব কথা ভুলে যান।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানা বলল, 'কিন্তু আপনি রুবিনাকে কোনও দিন এসব কথা বলেননি কেন?'

বুকের ওপর দুটো টোকা দিল মাহমদু। 'আমার মস্ত বড় একটা অসুখ আছে। আর একমাস আমার আয়ু। বলা কি ঠিক হত?' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। 'একঘণ্টা প্রায় হয়ে এসেছে। চলুন, গোয়েন্দারাম চাগলার সাথে খানিক আলাপ করা যাক।'

'সেলিম খানকে তাহলে ফেরত দিতেই হচ্ছে?'

'তাছাড়া আর উপায় কি? দিতেই হবে।'

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল মাহমুদ।

'রামলাল যোশী স্পীকিং। কর্নেল চাগলা?'

সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইল। কথা শেষ না হলে জানতে পারবে না কিছুই, মাহমুদের ভাব-ভঙ্গি থেকে যতটুকু পারা যায় আঁচ করবার চেষ্টা করতে থাকল সবাই। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাহমুদ, চোখজোড়া ঘরের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু কিছুই দেখছে না। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

'অসম্ভব! একঘণ্টা সময় দিয়েছিলাম, কর্নেল চাগলা। কিছুতেই আর অপেক্ষা করব না আমরা। সারাদিন বসে বসে মাছি মারতে থাকি আর আপনি রয়ে সয়ে সব ক'জনকে অ্যারেস্ট করুন। আমরা পাগল নই, কর্নেল চাগলা।'

'কি হলো?'

অল্পক্ষণ চুপচাপ শুনল সে চাগলার কথা। তারপর ওপার থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনেই চমকে উঠল। হাতে ধরা রিসিভারটার দিকে চাইল

একবার, তারপর নামিয়ে রাখল সেটা। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে কয়েক সেকেণ্ড কি যেন চিন্তা করল সে।

'চাগলা বলছে মিনিস্টার শহরে নেই। ওর গ্রামের বাড়িতে টেলিফোন নেই বলে তাকে আনবার জন্য গাড়ি-পাঠানো হয়েছে। আধঘণ্টা খানেকের মধ্যে, ইশশ্, গর্দভ আমি একটা!'

'ভেঙে বলো, মাহমুদ!' জিঞ্জিরের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'আমি একটা ছাগল। উমর, ট্রাকটায় স্টার্ট দাও। এক্ষুণি। খান হ্যাণ্ড গ্রেনেড আর ওই ব্রিজটা ওড়াবার পক্ষে যথেষ্ট অ্যামেনিয়াম নাইট্রেট, আর সেই সাথে ফিল্ড টেলিফোনটা। জলদি! শিগগির বেরোও সবাই বাড়ি থেকে!'

কেউ কোনও প্রশ্ন করল না মাহমুদকে। ছুটে বেরোল সবাই বাড়ি থেকে। আধ মিনিটের মধ্যে সব মালপত্র উঠে গেল ট্রাকে। সবশেষে এল মাহমুদ। থমকে দাঁড়াল গেটের সামনে। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল ওর নাক-মুখ দিয়ে। অনেক রক্ত। ছুটে গিয়ে ধরল ওকে রানা। সরিয়ে দিল সে রানাকে একপাশে। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক-মুখের রক্ত মুছে ফেলে দিল রুমালটা। কারও সাহায্য ছাড়াই গাড়িতে উঠে বসল সে।

'মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, জিঞ্জির! কর্নেল চাগলা ফোন করেছে পাবলিক টেলিফোন থেকে। আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। এ-আরবিকে-র কর্নেল চাগলা পাবলিক টেলিফোন থেকে কেন ফোন করছে? কারণ, শ্রীনগরে নেই সে এখন। এর আগের বারও নিশ্চয়ই সে শ্রীনগর থেকে ফোন করেনি, করেছিল ওদের সোপুর ব্রাঞ্চ থেকে। ধূর্ত, ধড়িবাজ চাগলা শ্রীনগর থেকে রওনা হয়ে গেছে অনেক আগে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে সে দলবল নিয়ে। আমাদের দেরি করাবার জন্যে পথে পথে থেমে ভুয়ো টেলিফোন করছে। মিনিস্টার, গভর্নমেন্ট পারমিশন, সব মিথ্যে কথা। কয়েক ঘণ্টা আগেই রওনা হয়ে গেছে সে শ্রীনগর থেকে। আমরা এখানে পৌঁছবার আগেই। ছিঃ ছিঃ, এই সাধারণ চালে ঠকে গেলাম আমি। আমাদের থেকে পাঁচ মাইল দূরেও নেই সে এখন! দশ মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছবে এখানে।'

এগারো

অবিরাম ঝরছে তুষার। ঠক ঠক করে কাঁপছে ওরা টেলিফোন পোস্টের কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে। অসম্ভব শীত। মাহমুদের পক্ষে, ঠাণ্ডা লাগানো এখন আত্মহত্যার সমান—কিন্তু অনেক বলেও কেউ ওকে ট্রাকের ভেতর পাঠাতে পারল না।

ব্রিজ পার হয়ে জঙ্গলের আড়ালে ট্রাকটা রেখে সরে এসেছে ওরা বাড়ির কাছে। মাহমুদ আর খান অ্যামেনিয়াম নাইট্রেট বসিয়েছে পুলের গোড়ায়। ট্রাকের চাকার দাগ মুছে ফেলেছে সবাই মিলে। অ্যামেনিয়াম নাইট্রেট থেকে প্লাঞ্জার পর্যন্ত তারটা ঢেকে দেয়া হয়েছে তুষার দিয়ে। ঝোপের আড়ালে প্লাঞ্জার নিয়ে লুকিয়ে

পড়েছে খান।

এরই মধ্যে বাঁদরের মত অনায়াসে পোস্ট বেয়ে উঠে কানেক্শন্ দিয়ে দিয়েছে উমর ফিল্ড টেলিফোনের সাথে দুটো তারের। দশ মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিল ওরা।

আরও দশ মিনিট কেটে গেল। মজ্জায় গিয়ে ঢুকছে যেন শীত। এমন সময় মোড়ের ওপর দেখা গেল শত্রুপক্ষকে। সামনে প্রকাণ্ড ট্রাকের মধ্যে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল কর্নেল গোয়েঙ্কারাম চাগলাকে। ওটা ওর ট্রাক-কাম-অফিস। পেছন পেছন এল একটা খাকী রঙের ট্রাক, সোলজার ভরা। তৃতীয় গাড়িটা দেখে চমকে উঠল সবাই। বিরাট একখানা আর্মার্ড হাফ-ট্রাক, অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গান ফিট করা আছে। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছে চাগলা।

একশো গজ থাকতেই হাফ ট্রাককে পেছনে ফেলে দ্রুত এগিয়ে গেল সামনের ট্রাক দুটো বাড়ির কাছে। ঝপাঝপ্ লাফিয়ে নামল জনা বিশেক সৈনিক, ঘিরে ফেলল পুরো বাড়িটা।

'বুম্‌ম্!'

পঞ্চাশ গজ এসেই থেমে গিয়েছিল হাফ ট্রাক। বাড়ির দেয়াল লক্ষ্য করে কামান ছুঁড়তে আরম্ভ করল। নিচ থেকে শুরু করছে ওরা। কয়েক সেকেণ্ড পরপর ধসে পড়ছে দেয়ালের এক্কেক অংশ। বিরাট গর্ত হয়ে গেছে বাড়িটার গায়ে। অল্পক্ষণেই সমস্ত বাড়ি ধসে পড়বে।

'হারামজাদারা মনে করেছে আমরা আতঙ্কিত মুরগীর বাচ্চার মত ছুটোছুটি করছি এখন সারা বাড়িময়। গোয়েঙ্কারামকে ভয়ঙ্কর লোক বলে জানতাম...' প্রচণ্ড 'বুমম্!' শব্দের জন্যে একটু থামল মাহমুদ। 'কিন্তু কতখানি ভয়ঙ্কর আজ টের পেলাম। একটি প্রাণীকেও আস্ত রাখবে না সে।'

'ওরা মনে করেছে, আমরা ওই বাড়ির মধ্যেই আছি। আমাদের খুন করতে চাইছে ওরা!' কেঁপে উঠল ডক্টর সেলিমের গলাটা।

'নিশ্চয়ই। টারগেট প্র্যাকটিস করছে না, খুন করতেই এসেছে। এক আধজন যদি বেরিয়ে ভাগতে চেষ্টা করে, সেজন্যে ঘেরাও করে রেখেছে বাড়িটা। বেরোলেই কুকুরের মত গুলি করে মারবে।'

'আচ্ছা! তাহলে আমার সার্ভিসের আর কোনও প্রয়োজন নেই ওদের?'

'আছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন জিঞ্জির ওরফে মেজর জেনারেল দিলদার বেগকে হত্যা করা। অধিকৃত কাশ্মীরে ওঁর চেয়ে বড় শত্রু ওদের আর কেউ নেই।'

রানা বুঝল, বাজে কথায় ভুলাচ্ছে মাহমুদ বৃদ্ধকে। আসলে ওরা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে ভবিষ্যতে প্রফেসরকে দিয়ে কাজ করাতে পারবে না। কাজেই ডক্টর সেলিম বাঁচুক বা মরুক তাতে ওদের কিছু এসে যায় না, পাকিস্তানের হাতে না গেলেই হলো। তাহলে কোন্ ভরসায় সে ছেড়ে দিচ্ছে ডক্টর সেলিমকে ওদের হাতে? দৃঢ় সংকল্পে বদ্ধপরিকর হলো রানা, কিছুতেই এই বন্দী বিনিময় হতে দেবে না সে। এই বৃদ্ধের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার কোনও অধিকার নেই ওর।

'সর্বনাশ! এরা মানুষ না পিশাচ।' অবাক চোখে চেয়ে রইলেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক

এই নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার দিকে।
'ওকে কেউ দেখতে পেয়েছ? রুবিনাকে?' জিজ্ঞেস করল জিঞ্জির। সবাই মাথা নাড়ল। কেউ দেখেনি। 'তাহলে এখন ফোন করে দেখা যাক কি বলে চাগলা।'
বাড়ির ভেতর ফোন বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং। এখান থেকেও স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা। চিৎকার করে কিছু বলল চাগলা। হাতের ইশারায় হাফ ট্রাকের গোলাবর্ষণ বন্ধ করবার ইঙ্গিত করল। ওর আদেশ পেয়ে চারদিক থেকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল সৈনিকেরা হৈ-হৈ করে। সবার আগে আগে চলেছে শম্ভু। দুই মিনিটের মধ্যেই সারা বাড়ি খুঁজে কাউকে না পেয়ে খবর দিল শম্ভু চাগলাকে। চাগলা ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে।
'মেজর জেনারেল দিলদার বেগ বলছেন নিশ্চয়ই?' পরিষ্কার ভেসে এল চাগলার কণ্ঠস্বর। রিসিভার ছাড়াও একটা ছোট স্পীকারে কানেকশন দেয়া আছে। সবাই শুনতে পেল কথাগুলো।
'হ্যাঁ। এই কি আপনাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার রীতি নাকি, কর্নেল চাগলা?'
'ছেলেমানুষী প্রশ্ন করে লজ্জা দেবার বৃথা চেষ্টা করবেন না। কোথা থেকে বলছেন আপনি জানতে পারি?'
'আপনার প্রশ্নটাও ছেলেমানুষী হয়ে গেল না? রুবিনাকে এনেছেন সাথে?'
'নিশ্চয়ই। আমি বলেছিলাম নিয়ে আসছি।'
'দেখাতে পারবেন?'
'আমাকে বিশ্বাস করছেন না?'
'বাজে কথা রাখুন, আমি দেখতে চাই ওকে।'
'একটু ধরুন, চিন্তা করে দেখি।'
রিসিভারটা নামিয়ে রাখল কর্নেল। উত্তেজিত কণ্ঠে রানা বলল, 'জিঞ্জির! ও চিন্তা করছে না। ওই ধূর্ত শিয়ালের চিন্তার কোনও প্রয়োজন হয় না। সময় নিচ্ছে ও, আর কিছু না। ও জানে, আমরা এমন এক জায়গায় আছি যেখান থেকে দেখতে পাব ওদের—তাহলে ওরাও কেন চেষ্টা করলে দেখতে পাবে না আমাদের? ও নিশ্চয়ই এতক্ষণে হুকুম দিয়ে···'
চিৎকার করে কেউ কিছু বলল। হাফ-ট্রাকটা ঘুরল ওদের দিকে।
'টেক কাভার!' চিৎকার করে উঠল রানা। দেখে ফেলেছে ওরা এদের পরিষ্কার। হাফ-ট্রাকটা ঘুরে পেছন দিক থেকে আসবার চেষ্টা করবে—জঙ্গলের মধ্যে ফায়ার করে লাভ হবে না। কিন্তু ওদের সোলজাররা এখনি ফায়ারিং আরম্ভ করবে।
'ফায়ার!' দূর থেকে চাগলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সাথে সাথে গর্জে উঠল দশ বারোটা অটোমেটিক কারবাইন্। কোনটা হাতুড়ির মত ঠক্ করে এসে লাগল গাছের গায়ে, কোনটা গাছের গায়ে পিছলে বেরিয়ে গেল রানাদের কানের পাশ দিয়ে, কোন কোনটা আবার ছোট ছোট শাখা ভেঙে ওদের মাথার ওপর ফেলল। সতর্ক হবার আগেই গুলি খেলো জিঞ্জির। ধড়াস্ করে আছড়ে পড়ল সে রাস্তার পাশে তুষারের ওপর। রানা মোটা গাছটার পেছন থেকে বেরিয়ে এগোচ্ছিল জিঞ্জিরের দিকে। ধমকে উঠল মাহমুদ।

'আপনি মরতে চান নাকি?'

'মরেনি। পা-টা একটু একটু নড়ছে। সরিয়ে না আনলে যে-কোনও মুহূর্তে আরেকটা গুলি লেগে শেষ হয়ে যাবে।' হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল রানা জিঞ্জিরের দিকে। আরেক রাউণ্ড গুলি ছুটে এল শত্রুপক্ষ থেকে। রানা পৌঁছে গেছে জিঞ্জিরের পাশে। পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যেই জিঞ্জিরকে নিয়ে সরে এল সে গাছের আড়ালে। কোথায় গুলি লেগেছে দেখতে পেল না রানা। আঘাতের পরিমাণও বোঝা গেল না তাড়াহুড়োতে। ছুটল রানা খানের উদ্দেশে—জিঞ্জিরের কাছ থেকে সিগন্যাল পেলে পরে ওর পুল উড়িয়ে দেবার কথা ছিল। যদি জিঞ্জিরের সিগন্যালের অপেক্ষায় বসে থাকে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু খামিসু খানকে কিছু বলতে হলো না। একটু এগিয়েই রানা দেখল ব্রিজের গোড়ায় এসে গেছে হাফ-ট্রাকটা। এবার উঠে আসছে। তবু কিছু বলছে না কেন খান? এইবার নামছে, আর দশগজ এলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঠিক এমনি সময় তীব্র আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কানে তালা লাগার উপক্রম হলো, ধসে পড়ল ব্রিজের একাংশ। সাথে সাথেই নাকটা নিচের দিকে করে অদৃশ্য হয়ে গেল হাফ-ট্রাক দৃষ্টিপথ থেকে। ধাতব আওয়াজ এল কানে, তারপরই কেঁপে উঠল মাটি ভারি আর্মার্ড ট্রাকটা নিচে গিয়ে পড়তেই।

ফায়ারিং বন্ধ করে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখছে সোলজারগুলো হাফ-ট্রাকের পরিণতি। রিসিভার তুলে নিয়ে রিং করল মাহমুদ।

'চাগলা? যোশী বলছি। মাথা খারাপ বুদ্ধু তুমি। জানো কাকে গুলি করেছ?'

'কি করে জানব? আর জানলেই বা কি হবে?'

'বলছি কি হবে। মেজর জেনারেল দিলদার বেগকে গুলি করেছ তোমরা। বেঁচে আছে কিনা জানি না। যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে ভাল চাও তো আমাদের সঙ্গে তুমিও বর্ডার ক্রস করে ভেগে পড় আজই সন্ধ্যায়।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি, যোশী?'

'শোনো। শুনলেই বুঝতে পারবে কার মাথা খারাপ হয়েছে, আমার না তোমার। রুবিনা হচ্ছে মেজর জেনারেল দিলদার বেগের একমাত্র কন্যা—কেবলমাত্র সেইজন্যেই রাজি হয়েছিলাম বন্দী বিনিময়ে। আমরা এখনও পরীক্ষা করে দেখিনি, যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে তার মেয়ের ব্যাপারে আর আমাদের কোনও উৎসাহ থাকবে না। যা ইচ্ছা তাই করতে পারো ওকে নিয়ে। আজই সন্ধ্যায় আমরা সবাই বর্ডার পার হয়ে চলে যাব। কালকের খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হবে এই খবর। পৃথিবীর সমস্ত লোক জানতে পারবে যে প্রফেসর সেলিম খানকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে পাকিস্তান—তোমরা শত চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারোনি। তোমাদের নির্যাতনের কাহিনীও জানতে পারবে সারা পৃথিবীর লোক। ভারতের সম্মান কোথায় থাকবে বিশ্বজনের কাছে? সেই সাথে তোমার অবস্থাটা কি হবে চিন্তা করো একবার। তোমাদের সরকারের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়বে তোমার ওপর—তোমার বোকামির জন্যেই হাতছাড়া হয়ে গেল প্রফেসর সেলিম খান। আমরা এই ব্যাপারে তোমার ভূমিকাটা বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করব, কর্নেল। যদি জিঞ্জির মারা যায়—তুমিও মরবে। বুঝতে পারলে,

চাগলা?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে বোধহয় সামলে নিল কর্নেল। তারপর বলল, 'মারা গেছে কিনা দেখুন না, মেজর যোশী?'

'দেখছি। তুমি তোমার তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে থাকো যেন না মরে। আর ওই কুত্তাগুলোকে গুলি ছুঁড়তে বারণ করো।'

'আমি এক্ষুণি গুলি বন্ধ করে দিচ্ছি।'

'যদি সত্যিই মারা গিয়ে থাকে তাহলে কি আপনি রুবিনাকে ছেড়ে দেবেন ওদের হাতে?' রানা বিস্ময় প্রকাশ করল। এই লোকটাকে বোঝা যায় না কিছুতেই।

'পাগল নাকি? ব্লাফ দিলাম। চলুন। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাই।'

গাছের আড়াল থেকে এবার নির্ভয়ে বেরিয়ে এল ওরা। জিঞ্জিরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল মাহমুদ। শ্বাসক্রিয়া চলছে জিঞ্জিরের। কোট খুলে জখমটা পরীক্ষা করে আনন্দিত কণ্ঠে বলল মাহমুদ, 'এত সহজে জিঞ্জির ছিঁড়বে না, মিস্টার রানা। এই জিঞ্জির যেদিন ছিঁড়বে সেদিন স্বাধীন হবে কাশ্মীর। ঘাড়ের কাছ দিয়ে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেছে গুলিটা।'

খামিসু খান এসে দাঁড়িয়েছিল। অনায়াসে কোলে তুলে নিল সে জিঞ্জিরের জ্ঞানহীন দেহ, যেন একটা শিশুকে কোলে তুলছে। বলল, 'জখম কি খুব বেশি, ফজল?'

'না। আধঘন্টার মধ্যেই হেঁটে বেড়াতে পারবে। হঠাৎ ঝট্‌কা লাগাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তোমার ব্রিজ ওড়ানোর টাইমিংটা চমৎকার হয়েছে, খান। উমর, তুমি প্লায়ারস্ নিয়ে তৈরি থাক। যেই বলব, অমনি ঘ্যাচ করে তার কেটে দিয়ে ছুটে গাড়ির ড্রাইভিং সীটে গিয়ে উঠবে।'

ফোন তুলে নিল মাহমুদ। 'চাগলা? যোশী বলছি। মরেনি জিঞ্জির। ঘাড়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে, কিন্তু বাঁচবে। তবে তোমাকে আমি একটা কানাকড়ি দিয়েও বিশ্বাস করি না। তাই বন্দী বিনিময় এখানে হবে না। সেই ফেরীর কাছে চলে যাও, আমরা আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছব সেখানে। বোঝা গেছে?'

'হুম্। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছব আমরা ওখানে গিয়ে।'

'আমাদের অনুসরণ করবার চেষ্টা করে লাভ নেই, মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে তোমার। আর এই টেলিফোনে রামপুর পোস্টকে পেছন থেকে আক্রমণ করবার আদেশ যেন দিতে না পারো সেজন্যে লাইনটা কেটে দিয়ে যাচ্ছি। যদি এক ঘন্টার মধ্যে নদীর তীরে না পৌঁছাও গিয়ে দেখবে চলে গেছি আমরা। গুড বাই।'

জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে চলে গেল ট্রাকটা মেইন রোড ধরে।

সন্ধে হয়ে আসছে। একটা ঝোপের আড়ালে ট্রাক রেখে হেঁটে ফিরে এল সবাই চারশো গজ। কাদা দিয়ে গাঁথা ইঁটের একটা বাড়ি। ফেরী পারাপারের মাঝি থাকে এক অংশে—বাকিটা গেস্ট হাউস। দুই ধমকে মাঝিকে ভাগিয়ে দিল মাহমুদ। একটা ছেঁড়া ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে—দু'ঘন্টা পর ফিরবে।

প্রথমে গেস্ট হাউস। ছোট ছোট দুটো ঘর। একটা বসার ঘর, একটা বেডরুম।

তারপর মাঝির ঘরটা। মাঝির ঘরে কাঠের চুলোয় গনগনে আগুন জ্বালা রয়েছে। জিঞ্জিরকে শোয়ানো হলো সেই ঘরে খাটের ওপর তেল চিটচিটে বিছানায়। জ্ঞান ফিরে আসছে ওর—বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে মাঝে মাঝে।

ছোট ছোট পাথর ফেলে খরস্রোতা এই নদীর পাড়টা রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে ভাঙন থেকে। একটা নৌকা বাঁধা আছে এপারে। নেমে গেল রানা ও মাহমুদ পার বেয়ে। রশি দিয়ে চালানো হয় এই নৌকো, দাঁড় বা লগি নেই। দুই গলুইয়ের মধ্যে দুটো ফুটো আছে—তার ভেতর দিয়ে একটা রশি ঢুকিয়ে নদীর দুই পারে দুটো গাছের গুঁড়ির সাথে শক্ত করে টেনে বাঁধা। রশি ধরে টান দিলেই সামনে এগোবে নৌকো। চমৎকার ব্যবস্থা। স্রোতে ভেসে যাওয়ার ভয় নেই।

নদীর অপর পারে বেশ অনেকটা জায়গা ফাঁকা। তারপর জঙ্গল।

আলো থাকতে থাকতে চারিটা পাশ ভাল করে দেখে ফিরে এল ওরা মাঝির ঘরে। চোখ খুলে চেয়েছে জিঞ্জির—কিন্তু ঘোরটা কাটেনি এখনও। সবে মাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছে মাহমুদ এমনি সময় ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকল উমর।

'কি ব্যাপার, উমর? এত ব্যস্ততা কিসের?'

'কর্নেল চাগলা এসে গেছে। নদীর ওই পারে জমা হয়েছে অনেক লোক, ফার্স্ট ক্লাস ফাইট হবে বলে মনে হচ্ছে!' আকর্ণ হাসল উমর। চঞ্চল হয়ে উঠেছে ওর তরুণ রক্ত।

ম্যাচের কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে মাটিতে ফেলল মাহমুদ। লম্বা একটা টান দিয়ে ফুসফুস ভর্তি করে ধোঁয়া নিল, তারপর বলল, 'চলো। যাচ্ছি।'

বারো

বেরিয়ে যাচ্ছিল মাহমুদ। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে একটা হাত তুলে বাধা দিল সে।

'আপনি এখানেই থাকুন, ডক্টর সেলিম।'

'আমি এখানে থাকব? আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন যে আমিই একমাত্র লোক যে এখানে থাকছি না।'

'তা ঠিক। কিন্তু আপাতত থাকতে হবে আপনাকে। খান, দেখো, উনি যেন ভেতরেই থাকেন।'

নদীর তীরে চলে এল মাহমুদ। রানাও এল সাথে। নদীর একেবারে তীরে এসে দাঁড়িয়েছে চাগলার লোকজন। ছায়ামূর্তির মত মনে হচ্ছে ওদেরকে। চেনা যাচ্ছে না শম্ভু ছাড়া আর কাউকে। ওর মাথাটা সবার মাথার ওপরে। সবচেয়ে আগে একেবারে পানির ধার ঘেঁষে যে লোকটা দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশে বলল মাহমুদ, 'কর্নেল চাগলা?'

'বলুন, মেজর যোশী।'

'রাত হয়ে যাচ্ছে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বন্দী বিনিময় সেরে ফেলতে হবে। দিনের বেলাই তুমি যে রকম হারামীপনা করলে, রাতে না জানি কি

করবে! কাজেই ঝটপট কাজ করতে হবে।'

'আমি আমার কথা রক্ষা করব।'

'যে-সব শব্দের মানে জানো না, সে-সব শব্দ ব্যবহার কোরো না। ''কথা রক্ষা''-র তুমি কি বোঝ? যাক, তোমার ট্রাক আর লোকজনকে দুশো গজ দূরের ওই জঙ্গল পর্যন্ত সরে যাবার আদেশ দাও। ওখান থেকে তাক করে আমাদের গায়ে গুলি লাগাতে পারবে না।'

চাগলার আদেশে সবাই সরে গেল পানির ধার থেকে। ও বলল, 'এবার?'

'ওখান থেকে ট্রাকে ফিরেই তুমি ছেড়ে দেবে মেজর জেনারেলের মেয়েকে। ফেরীর দিকে হাঁটতে থাকবে রুবিনা আর এখান থেকে প্রফেসর নৌকোয় চড়ে পার হতে থাকবে নদী। নৌকো থেকে নেমে তীরে উঠে দাঁড়িয়ে থাকবে প্রফেসর। রুবিনা কাছাকাছি আসতেই ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকবে তোমাদের দিকে। ডক্টর সেলিম তোমাদের কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই রুবিনা পৌঁছে যাবে এপারে। অন্ধকারে আন্দাজে গুলি ছুঁড়ে কোনও সুবিধা করতে পারবে না। কাজেই, নো শূটিং। অলরাইট?'

'অলরাইট!' ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হলো সে জঙ্গলের দিকে। চিন্তান্বিত মুখে কিছুক্ষণ গাল ঘষল মাহমুদ হাতের তালু দিয়ে।

'একটু যেন বেশি বাধ্য ভাব দেখাচ্ছে। একটু যেন···নাহ্। অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ মন আমার। কী করতে পারে সে? কিচ্ছু না।' গলা উঁচু করে ডাকল সে। 'খান! উমর!'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কাছাকাছি আসতেই জিজ্ঞেস করল মাহমুদ, 'কেমন আছে এখন জিজ্রির?'

'উঠে বসতে পারছে, কিন্তু শুয়ে থাকতে বলেছি। বিশ্রাম দরকার।'

'ঠিক করেছ। এখন নৌকোটা একটু টেনে পানিতে নামাবে তোমরা?' রানার দিকে ফিরল মাহমুদ। 'ডক্টর সেলিমকে দুই একটা কথা বলতে চাই আমি, একা। আপনি হয়তো বুঝবেন। দুই মিনিটের বেশি লাগবে না। কিছু মনে করলেন না তো?'

'না-না, কি মনে করব?'

মাঝির ঘরে গিয়ে ঢুকল মাহমুদ। তিনজন মিলে নৌকোটা টেনে নামাল ওরা পানিতে। তারপর খান আর উমর চলে গেল বাড়িটার দিকে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রইল রানা একা। সময় ফুরিয়ে আসছে। কি করবে সে? সেলিমখান, না রুবিনা? দু'জনেরই জীবন-মরণ প্রশ্ন। খোদা, বলে দাও, কোনটা করা উচিত? নাকি সে-ই যাবে ডক্টর সেলিমের বদলে?

ঠিক এমনি সময়ে কাঁধের ওপর হাত পড়ল। দেখল প্রফেসর সেলিম খান দাঁড়িয়ে হাসছেন ওর দিকে চেয়ে। পরমুহূর্তে চিনতে পারল রানা। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'মাহমুদ! আপনি! ডক্টর সেলিম কোথায়?'

'অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন বেডরুমের খাটের ওপর। অল্পক্ষণেই জ্ঞান ফিরে আসবে। এই অভিনয়টুকু আমাকে করতেই হলো, রানা। সারাটা জীবনই অভিনয় করে গেলাম, শেষ যাত্রাতেও আরেকজনের রোলে পার্ট করতে যাচ্ছি।' রানার

পাশ কাটিয়ে নৌকোয় উঠতে যাচ্ছিল মাহমুদ। ডক্টর সেলিমের ওভারকোট পরে কুঁজো হয়ে হাঁটছে সে। হঠাৎ প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো রানা ওর মতলবটা বুঝতে পেরে। ছুটে গিয়ে ধরল ওর হাত।

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'দেখুন, ইচ্ছে করলেই খান আর উমরের মত আপনাকেও অভিনয় করে বোকা বানিয়ে রেখে যেতে পারতাম। কিন্তু তা করিনি। কারণ, আমি জানি, ওদের মত আবেগপ্রবণ হয়ে আমাকে আপনি বাধা দেয়ার চেষ্টা করবেন না। আমি আর এক সপ্তাহ বাঁচব—না হয় এক সপ্তাহ আগেই গেলাম। ডক্টর সেলিমও থাকল, রুবিনাও থাকল, যে এমনিতেই যেত সে-ই কেবল গেল, একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গেল, এটাই ভাল হলো না?'

কোনও কথা বেরোল না রানার মুখ দিয়ে। স্তব্ধ হয়ে গেল সে মাহমুদের কথা শুনে। বলে কি লোকটা! ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখল মাহমুদ।

'এত কি ভাবছেন? ভাবনা চিন্তার ভারটা যোগ্য লোকের ওপর ছেড়ে দিন। বীরত্ব প্রদর্শন বা শিভালরি নয়—যেটা উচিত সেটাই করতে যাচ্ছি আমি। আমার বুদ্ধি ও বিবেচনার যে অকুণ্ঠ প্রশংসা করছিলেন আজ দুপুরে, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে আসতে না আসতেই কি সেই বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেল? ভেবে দেখুন, আমাকে বাধা দেবার কোনও অধিকার নেই আপনার।'

'সত্যিই। কোনও অধিকার নেই আমার। যোগ্যতাও নেই।' করুণ শোনায় রানার গলার স্বর।

'এই তো বুঝেছেন,' একগাল হাসল মাহমুদ। 'আসলে আমার কিন্তু রীতিমত আনন্দ হচ্ছে, মিস্টার রানা। জন্তু-জানোয়ারের মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে না মরে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আমার মৃত্যুটাকে বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি আমি, আচ্ছা আসি। খোদা হাফেজ।'

নৌকোয় গিয়ে উঠল মাহমুদ। চিৎকার করে সিগন্যাল দিল কর্নেল চাগলাকে। তারপর শিস দিতে দিতে চলে গেল রশি টেনে টেনে।

রানা মনে মনে বলল, এই ভাল হলো, খোদা, এই বোধহয় ভাল হলো। মাহমুদকে যেতে দিয়ে ভালই করেছে সে।

বাড়িটার দিকে চলল রানা উঁচু পাড় বেয়ে উঠে। দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল জিঞ্জির। রানাকে দেখে বলল, 'কি ব্যাপার, রানা? পাশের ঘরে খাটে শুয়ে ঘুমাচ্ছেন কেন ডক্টর সেলিম? বাইরে চিৎকার করল কে?'

'চিৎকার করেছে মাহমুদ। রুবিনাকে ওপার থেকে মুক্তি দেবার সঙ্কেত। ছাড়া পেয়ে রুবিনা এগিয়ে আসবে এদিকে, আর সেলিম খান যাবেন এদিক থেকে ওদিকে।'

'কিন্তু সেলিম খান তো ঘুমাচ্ছেন...'

'অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। মাহমুদ চলে গেছে ওঁকে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে ওঁর কোট পরে ওঁর বদলে।'

'কি বললে?' চমকে উঠল জিঞ্জির। পরমুহূর্তেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারল। রানার পিছু পিছু এসে দাঁড়াল পাশের ঘরে। ডক্টর সেলিম তখন উঠে বসবার চেষ্টা

করছেন। হাত ধরে তাঁকে সাহায্য করল রানা বসতে।

'মাহমুদ সাহেব কোথায়? আমার কোট?'

টেবিলের ওপর থেকে মাহমুদের কোট তুলে এগিয়ে দিল জিঞ্জির। 'এই কোটটা পরে নিন, আপনারটা মাহমুদ ধার নিয়েছে।'

'কিন্তু হ্যাণ্ড গ্রেনেড? আমাকে বলছিল ও-দুটো মারতে হবে ওদের ট্রাকের ওপর ছুঁড়ে। সেগুলো কোথায় গেল?'

ডক্টর সেলিমের বুঝবার দরকার নেই। জিঞ্জির আর রানা ঠিকই বুঝেছে। বর্ডারে পৌঁছবার আগেই যাতে ওদের ট্রাককে ওরা তাড়া না করতে পারে সেজন্যে গ্রেনেড নিয়ে গেছে মাহমুদ সাথে করে। বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। ওপারে পৌঁছে গেছে নৌকোটা। রুবিনাকে আবছা মত দেখা যাচ্ছে। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে সে নদীর দিকে। কিন্তু এত ধীরে হাঁটছে কেন সে! যে-কোন মুহূর্তে গুলি ছুঁড়তে পারে ওরা। নদীর অনেক কাছে না আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল মাহমুদ রুবিনার জন্যে। পেছন ফিরে একবার হাত নাড়ল এদের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে এগোল। রুবিনাকে পার হয়ে চলে গেল মাহমুদ। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রুবিনা। খুব সম্ভব চিনে ফেলেছে। আর এগোচ্ছে না সে।

ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল খান নদীতে। বিপদটা টের পেয়ে গিয়েছে সে আগেই। ওভার কোট খুলে রেখে নেমে গেছে সে নদীতে দ্বিধামাত্র না করে। টর্পেডোর মত ছুটে চলেছে সে পানিতে একরাশ ফেনা তুলে।

তীরে এসে দাঁড়াল রানা আর জিঞ্জির। খান পৌঁছে গেছে ওপারে। রুবিনার কাছাকাছি চলে গেছে একলাফে পাড় ডিঙিয়ে। ঠিক সেই সময় ফাটল প্রথম গ্রেনেডটা। বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার আগেই শোনা গেল দ্বিতীয় গ্রেনেডের শব্দ। তারপরই কানে এল মেশিনগানের তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দ। তিন সেকেণ্ড পর সব চুপ। গাল দুটো কুঁচকে গেল রানার। অন্ধকারে জিঞ্জিরের মুখের ভাব বোঝা গেল না, কি যেন বিড়বিড় করছে সে তখন। মারা গেল মহৎপ্রাণ মাহমুদ।

রুবিনাকে খেলনার মত তুলে নিল খামিসু খান। ছুটে চলে আসছে সে নদীর পারে। পেছন ফিরেই উমরকে দেখতে পেল রানা। 'বিপদ হতে পারে, উমর। তুমি গিয়ে ওই ঘরের জানালায় রেডি থাকো রাইফেল নিয়ে। খান নৌকোয় না ওঠা পর্যন্ত গুলি ছুঁড়ো না...'

কথা শেষ হবার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে উমর। রানা দেখল তীরে পৌঁছতে খানের আরও ত্রিশ গজ আছে, পঁচিশ... বিশ...তাও গুলি ছুঁড়ছে না কেউ। এমন সময় কয়েকজন লোকের চিৎকার শোনা গেল। কেউ আদেশ করল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। আরম্ভ হলো ফায়ারিং। রানার কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল একটা গুলি। শুয়ে পড়ল রানা মাটিতে। জিঞ্জিরকেও টেনে নামাল। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যেতে থাকল গুলি। একটু অবাক হলো রানা, কেবল একজন গুলি ছুঁড়ছে কেন? আর সবাই গেল কোথায়?

তীরে এসে গেছে খান। লাফিয়ে নামল পাড় থেকে। সাথে সাথেই গুলি আরম্ভ করল উমর। তিনটে গুলির পরই থেমে গেল মেশিনগান। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছু, কিন্তু মেশিনগান থেকে যে আগুনের ফুলকি দেখা গেছে সেটাই উমরের

জন্যে যথেষ্ট। নৌকোয় উঠে পড়েছে খান। ওর শক্তিশালী হাতের টানে দু'পাশে উঁচু ঢেউ তুলে স্পীড বোটের মত ছুটে আসছে নৌকোটা। রানা আর জিঞ্জির উঠে দাঁড়িয়ে তৈরি হলো নৌকোটা টেনে পারে তুলবার জন্যে। এমন সময় হঠাৎ হিশশ করে একটা শব্দ হলো, পর মুহূর্তেই ফট করে ফাটল পিস্তল থেকে ছোঁড়া ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার ঠিক ওদের মাথার একশো ফুট ওপরে। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে গেল চারিটা পাশ। সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে একটা মেশিনগান এবং কয়েকটা রাইফেল একসাথে গর্জে উঠল। গাছের আড়াল থেকেই গুলি ছুঁড়ছে কিন্তু অনেক দক্ষিণে সরে গেছে ওরা এখন, নদীর বাঁকের কাছে।

'আলোটা নিভিয়ে দাও, উমর।' চিৎকার করে উঠল রানা। টেনে তুলল ওরা নৌকোটাকে তীরে। হাঁটুতে ব্যথা পেল রানা গলুইয়ের বাড়ি লেগে। এমনি সময় দপ করে নিভে গেল আলোটা যেমন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল তেমনি হঠাৎ। কিন্তু ওপাশের গুলিবর্ষণ থামল না। অন্ধকারে এদেরকে দেখতে পাচ্ছে না ওরা, স্মৃতির ওপর নির্ভর করে গুলি চালাচ্ছে। আশপাশ দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে গুলি।

একটানে রুবিনাকে নামাল রানা নৌকো থেকে। কিন্তু ওপরে ওঠার জন্যে একটা পা বাড়িয়েই পড়ে গেল মাটিতে। হাঁটুতে বাড়ি লেগে অবশ হয়ে গিয়েছে পা। রশিটা ধরে ফেলল এক হাতে। খানের সাহায্যে পারে উঠে গেল রুবিনা, কয়েকটা পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, ছুটে চলে গেল সবাই বাড়িটার দিকে। নদীর তীরে পড়ে থাকল রানা একা। অল্পক্ষণেই ব্যথাটা কমে গেল, উঠে এল সে ওপরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কোটের আস্তিনে টান লাগল ওর—একটা বুলেট আস্তিন ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। ছুটে চলে এল সে বাড়ির মধ্যে। ধাক্কা খেলো উমরের সঙ্গে।

'তুমি জানালা থেকে সরে এলে কেন, উমর?'

'আর দরকার নেই।' দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাসি হাসল উমর। 'ফায়রিং বন্ধ করে দিয়েছে ব্যাটারা। জঙ্গলের মধ্যে ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি। ওরা ট্রাকে ফিরে যাচ্ছে এখন। মোট তিনটেকে শেষ করেছি, মি. রানা। শেষের দুটো ফ্লেয়ারের আলোতে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি। আপনি ফ্লেয়ারটা নেভাতে না বললে গোটা দশেক ব্যাগে পুরতাম।'

'তা তুমি পারতে। কিন্তু আলোটা নিভিয়ে আরও ভাল করেছ। আজ সবার প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি।' কাঁধের ওপর দুটো চাপড় দিল রানা উমরের। ঘুরে দেখল ডক্টর সেলিমের পাশে একটা সোফায় বসে দুই হাতে চোখ ঢেকে রেখেছে রুবিনা। এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখল রানা। রুবিনা চাইল ওর দিকে।

'ফজল ভাইয়া···ফজল ভাইয়াকে ওরা—'

আর বলতে পারল না রুবিনা। নদীর ওপারে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিল রুবিনা মাহমুদকে। অনেকক্ষণ থেকে রানার বুকের মধ্যে থেকে থেকে চাপা গর্জন করে উঠছিল একটা ক্রুদ্ধ বাঘ। এবার হঠাৎ পৃথিবী কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। মনস্থির করে ফেলেছে রানা। ডক্টর সেলিম নিরাপদ, রুবিনা নিরাপদ, ওর কর্তব্যটুকু ওকে করতে হবে এখন।

'খান, ট্রাকটা নিয়ে আসবে তুমি এখানে?'

'যাচ্ছি।' বেরিয়ে গেল খান। পানিতে ভেজা জামা কাপড়ে তুষার আর বরফ জমছে।

'তুমি চারদিকে নজর রেখো, উমর। আমি আসছি।'

বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। ঠেলে পানিতে নামাল নৌকোটাকে।

তেরো

প্রতিশোধ!

দাউদাউ করে জ্বলছে রানার বুকের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন। হত্যার নেশায় পেয়ে বসেছে যেন ওকে। মহৎপ্রাণ ফজল মাহমুদের হত্যার প্রতিশোধ সে নেবে, আয়ু শেষ হয়েছে গোয়েন্দারাম চাগলার।

ওপারে পৌঁছে রানা লক্ষ করল নিরস্ত্র সে। জিঞ্জিরের রিভলভারটা অন্তত সঙ্গে আনা উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর ফেরা যায় না। তীরে উঠেই প্রাণপণে ছুটল সে খোলা মাঠ দিয়ে জঙ্গলের দিকে। একটি বুলেটও বাধা দিল না ওকে। জঙ্গলে ঢুকে দাঁড়িয়ে দম নিল সে কিছুক্ষণ। ট্রাক দুটো দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার শেষ মাথায়। শিকারী শার্দুলের মত নিঃশব্দে এগোল সে গাছের আড়ালে আড়ালে।

তিন মিনিটে এসে দাঁড়াল সে ট্রাক দুটোর কাছে। কোনও সাড়া শব্দ নেই। ট্রাকের পেছনের দরজা বন্ধ। বাইরেও কাউকে দেখা গেল না। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েই বরফের মত জমে গেল। ট্রাকটার ওপাশ থেকে সাব-মেশিনগান হাতে একজন এ-আরবিকে গার্ড বেরিয়ে সোজা হেঁটে আসছে ওর দিকে।

এক নজর চেয়েই রানা বুঝল ওর উপস্থিতি টের পায়নি লোকটা, কারণ তাহলে সাব-মেশিনগানটা ঝুলিয়ে রাখত না বগলে চেপে। এক হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ধরা। নিশ্চিত হলো রানা। গার্ডটা কোনও রকম সন্দেহ করেনি, হাঁটাহাঁটি করে গা-টা গরম করবার চেষ্টা করছে মাত্র। রানার পাঁচ ফুট দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটা, ব্ল্যাক প্যান্থারের মত এগিয়ে গেল রানা ওর দিকে। লোকটা হঠাৎ যখন টের পেল, তখন দেরি হয়ে গেছে। আঙুলগুলো সোজা রেখে সর্বশক্তি দিয়ে কোপ মারল সে লোকটার ঘাড়ের ওপর। মুখটা হাঁ হয়ে থাকল, আওয়াজ বেরোল না কোনও। নিঃশব্দে ঢলে পড়ল সে মাটিতে। সাব-মেশিনগানটা মাটিতে পড়বার আগেই ধরে ফেলল রানা। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল সে ট্রাকটার দিকে। দেখল এঞ্জিনটা ধ্বংস হয়ে গেছে মাহমুদের হ্যাণ্ড গ্রেনেডের বিস্ফোরণে। বড় ট্রাকটার দিকে এগোতে গিয়েই হোঁচট খেলো রানা। একটা মৃতদেহ পড়ে আছে মাটিতে। এক নজরেই চিনতে পারল রানা। মাহমুদ। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা মৃতদেহটার পাশে। মেশিনগানের গুলিতে সারাটা বুক জুড়ে অসংখ্য ছিদ্র হয়ে গেছে ডক্টর সেলিমের কোট। কুকুরের মত গুলি করে মেরেছে ওরা মাহমুদকে—অন্ধকার শীতের রাতে ফেলে রেখেছে লাশ মাঠের মধ্যে, ঠিক মরা কুকুরের মত। স্থির, ঠাণ্ডা, মরা মুখটার ওপর তুষার জমছে একটু একটু

করে। মাহমুদের পকেট থেকে রক্তে ভেজা একটা রুমাল বের করে ঢেকে দিল রানা ওর মুখ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগোল ট্রাকটার দিকে।

একটা চেয়ারে রানার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে কর্নেল চাগলা। সামনে টেবিলের ওপর ওয়্যারলেস ট্র্যান্সমিটার। একটা হাতল কয়েক পাক ঘুরিয়ে বাম হাতে টেলিফোন রিসিভার তুলল সে কানে। রানা বুঝল ওটা ওয়্যারলেস ট্র্যান্সমিটার নয়, ওটা রেডিও টেলিফোন। নিশ্চয়ই শেষ উপায় হিসেবে এয়ার ফোর্সকে ডাকার চেষ্টা করছে। পরিষ্কার হয়ে আসছে আকাশটা। জিঞ্জিরের দলটাকে খুঁজে বের করতে খুব অসুবিধে হবে না ওদের। ট্রাক যখন, রাস্তার ওপর দিয়ে চলতেই হবে ওটাকে।

কানে রিসিভার থাকায় রানার প্রবেশ টের পেল না চাগলা। দরজাটা বন্ধ করে এগিয়ে এল রানা নিঃশব্দ পায়ে। যেই কথা বলতে আরম্ভ করল চাগলা অমনি সাব-মেশিনগানের ব্যারেলের বাড়িতে রিসিভারটা পড়ে গেল ওর হাত থেকে দুই টুকরো হয়ে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল চাগলা এই আকস্মিক আক্রমণে। কিন্তু সে কেবল দুই সেকেণ্ডের জন্যে, তারপর সাঁ করে রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে ফিরল রানার দিকে। রানা ততক্ষণে দুই পা পিছিয়ে গেছে, মেশিনগানের মুখটা চাগলার বুক লক্ষ্য করে ধরা। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল কর্নেল চাগলার মুখ, কি যেন বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠোঁট নড়ল কেবল, আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে। একবার ঢোক গিলবার চেষ্টা করল—কিন্তু জিভও শুকিয়ে গেছে।

'অবাক লাগছে, কর্নেল চাগলা?'

'তুমি খুন করতে এসেছ আমাকে!' রানার চোখে হত্যার নেশা দেখতে পেয়েছে সে স্পষ্ট। খশখশে শোনাল ওর গলাটা।

'খুন করতে? না আমি তোমাকে শাস্তি দিতে এসেছি। একে খুন বলে না। মেজর যোশীকে তোমরা যা করেছ সেটাকে বলে খুন। উঠে দাঁড়াও, কর্নেল চাগলা।'

উঠে দাঁড়াল চাগলা।

'হাজার হাজার কাশ্মীরী মুসলমানকে নির্মম ভাবে হত্যা করবার অপরাধে মৃত্যু ঘটবে তোমার। তোমার চোখে যে মৃত্যু-ভয় দেখছি আমি, তুমি তেমনি দেখেছ নির্যাতিত হাজার হাজার নিরপরাধ নিরীহ কাশ্মীরী মুসলমানের চোখে। এখন মায়া হচ্ছে নিজের প্রাণের ওপর—হাজার হাজার প্রাণ নষ্ট করবার সময় এই মায়াটা তো একবারও উদয় হয়নি মনের মধ্যে! ঘুরে দাঁড়াও, কর্নেল গোয়েঙ্কারাম চাগলা।'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার রানার চোখের দিকে, একবার সাব-মেশিনগানের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল চাগলা। হঠাৎ ডান হাতটা ওর দ্রুত চলে গেল ওয়েস্ট ব্যাণ্ডের হোলস্টারের কাছে, পরমুহূর্তেই পেছন না ফিরেই ট্রিগার টিপে দিল সে রিভলভারের, মুখটা রানার দিকে ফিরিয়ে।

'বুম!'

রানার ডান চোখের কিনারা থেকে নিয়ে কানের পেছন পর্যন্ত জ্বালা করে উঠল বুলেটের আঁচড়ে চামড়া ছড়ে যাওয়ায়। আর একটু বাঁয়ে সরলেই ওর

মৃতদেহের মুখে লাথি মেরে বিজয়ীর হাসি হাসতে পারত চাগলা, কিন্তু সে সুযোগ হলো না। যতক্ষণ পর্যন্ত সাব-মেশিনগানের ম্যাগাজিনটা সম্পূর্ণ খালি না হলো, থামল না রানা। ঝাঁঝরা হয়ে গেল কর্নেলের সারাটা পিঠ। হুমড়ি খেয়ে পড়ল রিভলভিং চেয়ারের ওপর। ধোঁয়ায় ভরে গেল গাড়ির অভ্যন্তর। ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে দেখল রানা চেয়ারের ওপর পড়ে অল্প অল্প দুলছে গোয়েন্কারাম চাগলার প্রাণহীন দেহ।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা বাইরে চাগলার রিভলভার হাতে নিয়ে। কিন্তু পাশের ট্রাকের মধ্যে থেকে বেরোচ্ছে না কেন ওরা? শুনতে পায়নি মেশিনগানের আওয়াজ?

হঠাৎ বুঝতে পারল রানা এই নীরবতার কারণ। ছুটে গিয়ে দেখল, সত্যি, একটি প্রাণীও নেই ছোট ট্রাকের মধ্যে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল রানার। সর্বনাশ হয়ে গেছে। ছি, ছি! এমন ভুলটা করতে পারল সে? মাহমুদের ওপর নির্ভর করতে করতে বুদ্ধিটা কি তার একেবারেই ভোঁতা হয়ে গেল? আগেই এই সন্দেহটা করেছিল মাহমুদ।

ওরা দক্ষিণ দিকে সরে গেছিল অনেকক্ষণ আগেই। এতক্ষণে নিশ্চয়ই নদী পার হয়ে পৌঁছে গেছে বাড়িটায়। একা বাচ্চা ছেলে উমর কি করবে? খানকে সে পাঠিয়ে দিয়েছে ট্রাকের কাছে।

শম্ভুর চেহারাটা ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়। এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটল রানা নৌকোর দিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠল সে নৌকায়। মাঝামাঝি আসতেই শুনল রানা প্রথম গুলি। পয়েন্ট টু-টু বোর। উমর গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে জানালা দিয়ে। সাথে সাথে গর্জে উঠল কয়েকটা থ্রী নট থ্রী রাইফেল, সেই সাথে ঠা-ঠা, ঠা-ঠা করে সাব-মেশিনগানের কর্কশ শব্দ। পাগলের মত টানতে থাকল রানা রশি ধরে। তীরে পৌঁছবার আগেই লাফিয়ে নামল সে নৌকো থেকে।

দশ মিনিটও হয়নি রানা এই বাড়িটা থেকে বেরিয়েছে। একটু আগেও গোলাগুলির শব্দ শুনেছে সে, এখন সবকিছু নিস্তব্ধ। ভেতরে কি অবস্থা কে জানে!

দরজা দিয়ে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল রানা। একজন এ-আরবিকে গার্ড পাশের ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রানার দিকে পেছন ফিরে ভিড়িয়ে রাখছে দরজাটা। পেছনে পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ঠকাস করে কাঠে কাঠে বাড়ি লাগল যেন। কানের পেছনে রিভলভারের বাড়ি খেয়ে ঢলে পড়ল গার্ডটা। উদ্যত রিভলভার হাতে ঢুকল রানা দরজা খুলে পাশের ঘরে।

দ্রুত এক নজর চোখ বুলিয়ে ঘরের অবস্থাটা বুঝে নিল রানা। ছয়জন এ-আরবিকে গার্ড দেখতে পেল সে ঘরের ভেতর। চারজন তাদের বেঁচে আছে এখনও। ডক্টর সেলিম বসে আছেন একপাশে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে। একটা কারবাইন ধরা আছে জিঞ্জিরের দিকে। আরেকজন ওর হাত বাঁধছে পিছমোড়া করে। ঘরের আরেক কোণে উমরের বুকের ওপর চেপে বসে গলা টিপে ধরেছে একজন। ছটফট করছে উমর ওর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যপ্রমাণ শম্ভু। একহাতে জড়িয়ে ধরেছে সে রুবিনাকে।

রানা বুঝল 'হ্যাণ্ডস আপে'র সময় পার হয়ে গেছে। যত্নের সঙ্গে পর পর

তিনটে গুলি করল সে দুই সেকেণ্ডের মধ্যে। প্রথম গুলিতে উমরের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল গার্ডটা, দ্বিতীয় গুলিতে বসে পড়ল জিঞ্জিরের দিকে কারবাইন ধরা লোকটা, আর তৃতীয় গুলি লাগল গিয়ে যে লোকটা জিঞ্জিরের হাত বাঁধছিল তার কপালে। এবার শম্ভুর কপাল লক্ষ্য করল রানা। এক ঝটকায় রুবিনাকে সামনে নিয়ে এল শম্ভু। আর সাথে সাথেই মাটিতে ছিটকে পড়ল রানার হাতের রিভলভার কব্জির ওপর একটা রাইফেলের প্রচণ্ড বাড়িতে। এই সপ্তম লোকটাকে দেখতে পায়নি সে আগে—দরজা খুলতেই তার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল।

'মেরো না, ওকে মেরো না!' চিঁ চিঁ করে চিৎকার করে উঠল, রুবিনা নয়, শম্ভু। গুলি করতে গিয়েও থেমে ট্রিগারের ওপর থেকে আঙুলের চাপ ঢিল করল সপ্তম লোকটা। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল শম্ভু রুবিনাকে, ওর সামনে থেকে। কোমরে দুই হাত রেখে লক্ষ করল সে রানাকে। একটা অদ্ভুত হিংস্র হাসি ফুটে উঠল ওর নাক ভাঙা কুৎসিত মুখে। 'দেখো, আরও কোনও অস্ত্র আছে কিনা ওর কাছে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলো।'

পরীক্ষা করে দেখে মাথা নাড়ল সপ্তম লোকটা। শক্ত করে বাঁধল রানার দুই হাত পিছনে নিয়ে।

'চমৎকার। এবার ধর এটা।' কোমর থেকে রিভলভার বের করে ছুঁড়ে দিল শম্ভু সপ্তম ব্যক্তির দিকে। শূন্যে ধরে ফেলল সে রিভলভারটা। দুই হাতের তালু ঘষল শম্ভু।

'তোমার একটা বিল শোধ করা হয়নি এখনও, মাসুদ রানা। ভুলে যাওনি বোধহয়? আজ তোমার পাওনা মিটিয়ে দেব কড়ায় গণ্ডায়।'

রানা বুঝল খালি হাতে ওকে হত্যা করবে এখন শম্ভু। হাত বাঁধা অবস্থায় কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না সে। মনের গভীরে উপলব্ধি করল সে—আর আশা নেই। দুই মিনিটও সে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না শম্ভুকে। তবু চেষ্টা করতে হবে যতক্ষণ পারা যায়, বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করবে কেন সে?

দুই পা এগিয়েই লাফিয়ে শূন্যে উঠল রানা, একসাথে দুই পায়ে প্রচণ্ড লাথি মারল শম্ভুর বুক লক্ষ্য করে। একটু অবাক হয়েছিল শম্ভু, কিন্তু চট করে পিছিয়ে গেল সে। লাথিটা লাগল ওর বুকের ওপর, কিন্তু পুরো ওজনে লাগল না। হুশ্ করে একটা শব্দ হলো ওর মুখ থেকে। আরও দুই পা পিছিয়ে গেল সে। দড়াম করে পড়ল রানা শূন্য থেকে মাটিতে। মাথায় ব্যথা পেল সে, কিন্তু উঠে পড়ল আছড়েপাছড়ে। মাটিতে পড়ে থাকলে লাথি খেয়ে মরতে হবে। এগিয়ে আসছে শম্ভু। আরেকটা লাথি চালাল রানা শম্ভুর হাঁটুর নিচে হাড়ের ওপর। কিছুমাত্র পরোয়া করল না শম্ভু, দড়াম করে এক হাতে মারল রানার পেট বরাবর সর্বশক্তি দিয়ে। ব্যথায় কুঁকড়ে গেল রানার দেহটা। এত প্রচণ্ড মার আর কখনও খায়নি সে। ষাঁড়ের শক্তি আছে শম্ভুর গায়ে। পেছনের দেয়ালে ধাক্কা না খেলে পড়ে যেত রানা। শ্বাস নিতে পারছে না সে আর। ঝাপসা হয়ে এল দুই চোখ। মনে হলো ওর নাম ধরে চিৎকার করে কিছু বলছে রুবিনা। কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না সে। হঠাৎ যেন কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না সে আর। ঝাপসা ভাবে দেখতে পেল ওর দিকে এগিয়ে আসছে শম্ভু। টলতে টলতে ছুটে গেল সে শম্ভুর দিকে। ওর দুরবস্থা

দেখে হেসে ফেলল শম্ভু। একপাশে সরে গিয়ে ধাঁই করে একটা ঘুসি মারল রানার চোয়ালে। ছিটকে গিয়ে খোলা কবাটের ওপর আছড়ে পড়ল রানা। মাথাটা ঠুকে গেল দরজার সাথে। পড়ে গেল সে মাটিতে।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে জ্ঞান হারাল রানা। আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েই চোখ মিট মিট করে আবছা হয়ে আসা দৃষ্টিশক্তিটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল সে। মাথাটা ঝাড়া দিয়ে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করল। দেখল ঘরের মাঝখানে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শম্ভু। বিজয় গর্বে বীভৎস হাসি ওর মুখে। রানা বুঝল, শম্ভু ওকে হত্যা করতে চায় ঠিকই, কিন্তু চট করে নয়, ধীরে ধীরে, রসিয়ে রসিয়ে।

দুর্বলভাবে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে থাকল রানা। সারাটা ঘর দুলছে চোখের সামনে। সমস্ত মনের জোর একত্রিত করবার চেষ্টা করল রানা। মারা সে একবারই যাবে—কিন্তু বীরের মত যুদ্ধ করে মরবে, যতক্ষণ একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট আছে গায়ে, হাল ছেড়ে দেবে না। এগোতে গিয়েই অবাক হলো সে শম্ভুর মুখ দেখে। হাসি মিলিয়ে গেছে শম্ভুর মুখ থেকে। লোহার মত একটা হাত রানাকে দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। রানা দেখল ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল খামিসু খান। সমস্ত দেহে তুষার জমে সাদা হয়ে আছে।

দরজার পাশের সপ্তম লোকটার মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল এই আকস্মিক অনুপ্রবেশে। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠেই রাইফেল তুলতে গেল, কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে তখন। ছোট ছেলের হাত থেকে বড়রা যেভাবে লাঠি কেড়ে নেয় তেমনি এক হেঁচকা টানে কেড়ে নিল খান রাইফেলটা ওর হাত থেকে। অন্য হাতে চেপে ধরল ওকে দেয়ালের সঙ্গে। কামড় দিয়ে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করল লোকটা। অনায়াসে মাথার ওপর তুলে নিল খান ওকে দুই হাতে। এক পাক ঘুরে অসম্ভব জোরে ছুঁড়ে মারল দেয়ালের গায়ে। দেয়ালের সাথে সেঁটে থাকল সে এক মুহূর্ত, যেন আঠা দিয়ে সাঁটিয়ে দিয়েছে কেউ ওকে ওখানে, তারপর মেঝের ওপর এসে পড়ল দড়াম করে।

বিপদ বুঝতে পেরে পেছন থেকে লাফিয়ে ধরেছিল রুবিনা শম্ভুর চুল। কয়েক মুহূর্ত দেরি করাতে পারলেও লাভ। কিন্তু এক ঝটকায় সরিয়ে দিল সে রুবিনাকে পিঠের ওপর থেকে। পর মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা খানের ওপর। সপ্তম গার্ডটাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়তে গিয়ে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল খান। শম্ভুর হাতের কয়েকটা আচমকা ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে। শম্ভু পড়ল ওর ওপর। প্রকাণ্ড দুই হাতে কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে সে খানের। শম্ভুর মুখে হাসি নেই, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যুদ্ধ করছে সে এখন। বুঝতে পেরেছে সে, একে কায়দা মত কাহিল করতে না পারলে মৃত্যু অনিবার্য।

দুই সেকেণ্ড চুপচাপ শুয়ে থাকল খান। শম্ভুর লোহার মত আঙুলগুলো চেপে বসল ওর কণ্ঠনালীর ওপর। প্রকাণ্ড কাঁধের পেশী দুটো ফুলে উঠেছে শম্ভুর সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরায়। বাইসেপ দুটো কাঁপছে থরথর করে। খানের দুই হাত এবার উঠে এসে ধরল শম্ভুর দুই কব্জি।

প্রথমে একটু অবাক হলো শম্ভু। খানের নখগুলো ক্রমেই ঢুকে যাচ্ছে ওর

কব্জির মধ্যে। পর মুহূর্তেই ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠল অবিশ্বাস তারপর ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখটা। সবশেষে সেই মুখে ফুটে উঠল ভীতি। মড় মড় করে শব্দ হচ্ছে ওর কব্জিতে। ধীরে ধীরে খুলে গেল শম্ভুর হাত, সরে এল খানের গলা থেকে। ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিল খান ওকে বুকের ওপর থেকে।

মাটিতে পড়েই হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল শম্ভু। একটা ঠ্যাং ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনল খান ওকে ঘরের মধ্যে। দরজার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করল শম্ভু—কিন্তু হেঁচকা টানে ছুটে গেল হাত। ঘরের মাঝখানে নিয়ে এসে দুই হাত ধরে দাঁড় করাল খান শম্ভুকে। খানের মাথা ছাড়িয়ে দশ ইঞ্চি উঁচুতে উঠে গেল শম্ভুর মাথা। সর্বশরীর ভয়ে কাঁপছে ওর থরথর করে। বাম হাতে প্রচণ্ড বেগে মারল খান শম্ভুর পেটে, ঠিক যেমন করে শম্ভু মেরেছিল রানাকে। কুঁকড়ে গেল শম্ভুর দেহ। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। পরমুহূর্তেই একটা ভয়ঙ্কর থাবড়া খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল শম্ভু। পা দিয়ে উপুড় করল খান ওর দেহটা, তারপর বসে পড়ল ওর পিঠের কাছে। মেরুদণ্ডের ওপর এক হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে বাম হাতে ধরল সে শম্ভুর চিবুক আর ডান হাত চালিয়ে দিল হাঁটুর নিচে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চোখ বুজল রুবিনা। দুই হাত ওপর দিকে উঠতে থাকল খানের। গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত বিকৃত গোঙানীর শব্দ বেরোল শম্ভুর। দুই চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত। একটা শিরা ফুলে উঠেছে কপালের।

শান্ত সরল নিষ্পাপ চোখ মেলে চাইল একবার খান রানার দিকে, মুচকে হাসল একটু। পরমুহূর্তেই মড়াৎ করে ভেঙে দিল শম্ভুর মেরুদণ্ডটা।

দূরে পাকিস্তানী চেক পোস্টের আলো দেখা যাচ্ছে। রুবিনাও নামল ট্রাক থেকে রানার পিছু পিছু।

'তুমি যাবে না আমার সাথে, রুবিনা?'

'আমার কাজ তো এখনও শেষ হয়নি, রানা। কাশ্মীরে আজাদী না এলে যে আমার মুক্তি নেই। আব্বাকে সাহায্য করবার জন্যে কেবল খান আর উমর তো যথেষ্ট নয়, আমারও দরকার আছে।' রানার কপাল থেকে একগুচ্ছ চুল সরিয়ে দিল রুবিনা।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চাইছিল, চেপে গেল রানা।

'আবার দেখা হবে না আমাদের?' গলাটা ভেঙে এল রুবিনার। চোখে টলমল করছে দু-ফোঁটা অশ্রু।

'হবে।'

'ততদিন অপেক্ষা করব আমি তোমার জন্যে।'

চেক পোস্টে পৌঁছে দেখল ওরা, তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাক। হাত নাড়ল রানা ও সেলিম খান, তারপর পেরিয়ে গেল সীমান্ত।